ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
আমীন আহসান ইসলাহী
মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ

ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ

অনুবাদ
আকরাম ফারূক

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি

♦ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ♦ আমিন আহসান ইসলামী ♦ মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ

অনুবাদ

আকরাম ফারুক

আবদুস শহীদ নাসিম

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ২২

ISBN : 978-984-645-099-6

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা

ফোন : ৮৩৩১৮০৩, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈসায়ী

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার

মুদ্রণ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

Islami Dawat and its Requirements. By Seyyed Abul A'la Maudoodi, Amin Ahsan Islahi and Mian Tufail Mohammad, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar, Dhaka. Phone : 8331803, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. First Edition : November 1999, 2nd Print : February 2014.

Price Tk. 100.00 Only.

আমাদের কথা

ইসলাম কি? ইসলামের দাওয়াত কি? ইসলামী দাওয়াতের পরিধি কি? তাৎপর্য কি? দাওয়াত দানকারীকে কি কি প্রশ্ন, অভিযোগ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে? প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় কি? কোন্ কোন্ ধরনের মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে? দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত পূর্ণ করা ও মেনে চলা উচিত? দা'য়ী তথা দাওয়াত দানকারীদের কি ধরনের চরিত্র ও গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া উচিত? এ কাজে সফলতা ও ব্যর্থতার তাৎপর্য কি? এ মহান কাজে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? – এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ বিষয়ের উপর এ যাবত যতো গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলতে এবং ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি ও পেরেশানি সৃষ্টিতে অনন্য। সাহস, দৃঢ়তা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অমূল্য ভান্ডার এটি! শুদ্ধি, সংস্কার ও প্রশিক্ষণের এক প্রাঞ্জল পরিশোধন গ্রন্থ এটি।

এ গ্রন্থটি মূলত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতাসহ জামায়াতের সূচনাকালীন পূরোধা ত্রীরত্নের তিনটি ভাষণের সংকলন। সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে।

এ গ্রন্থের বিভিন্ন বক্তব্যে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পূর্ব পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত থাকলেও মূল বক্তব্য বিষয় একেবারেই তাজা, সত্য ও শাশ্বত।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করতে পারায় আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

যারা এক আল্লাহর গোলামির জীবন গঠন, এক আল্লাহর দাসত্ব ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ এবং দাওয়াত, সংশোধন ও সংস্কার কাজের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলাতে চান, এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে কার্যকর হাতিয়ারের কাজ দেবে।

বাতিল সমাজ বদলিয়ে আল্লাহর বিধান ও রসূল সা.-এর আদর্শ ভিত্তিক সুসমাজ নির্মাণের পথে আল্লাহ পাক এ গ্রন্থটিকে উপযুক্ত উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করুন- আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম তারিখ ২৭/১০/৯৯
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

সূচিপত্র

ইসলামের দাওয়াত ও তার কর্মপন্থা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

[এটি হলো জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর একটি ভাষণ। ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৫ সালের ১৯ এপ্রিল নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে তিনি উক্ত শিরোনামে এ ভাষণ প্রদান করেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটস্থ 'দারুল ইসলামে।' ১৯, ২০ ও ২১ এপ্রিল ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে জামায়াতের রুকন (সদস্য) ছাড়াও শুভাকাংখী ও উৎসাহী ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনের এ সম্মেলনে মোট ডেলিগেট ছিলো এক হাজার।

–সম্পাদক]

"আমি সবসময় দীনকে বর্তমান কিংবা অতীতের ব্যক্তিগণের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাই আমার কাছে এবং প্রত্যেক মুমিনের কাছে আল্লাহর দীনের দাবি কী– তা জানার জন্যে অমুক ব্যক্তির মত কী– সেটা না দেখে কুরআন কী বলে এবং রসূল সা. কী করেছেন, তা দেখবার চেষ্টা করেছি।"

"আসলে আমরা এমন একদল লোক তৈরি করতে চাই, যারা একদিকে তাকওয়া পরহেজগারীর দিক থেকে প্রচলিত ধরনের 'মুত্তাকী' -'পরহেজগার'-দের চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহভীরু হবে; অপরদিকে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার দিক থেকে হবে সাধারণ দুনিয়াদারদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি দক্ষ ও যোগ্য। আমরা সালেহ লোকদের এমন একটি দল সংগঠিত করতে চাই, যারা হবে একদিকে আল্লাহভীরু, অকপট-সত্যাশ্রয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক এবং আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় নৈতিক গুণাবলীতে বলীয়ান; অপরদিকে জাগতিক সকল বিষয়ে দুনিয়াদার বস্তুপূজারীদের চাইতে হবে অনেক বেশি সমঝদার।"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সর্ব প্রথম আমি এ জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, তিনি একটা নিরস দাওয়াত ও অত্যন্ত বিস্বাদ কর্মপদ্ধতিকে জনগণের নিকট সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় করে তোলার কাজে আমাদের আশাতিরিক্ত সাফল্য দান করেছেন। আমরা যে দাওয়াত নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম, আজকের বিশ্ব বাজারে তার চেয়ে অচল পণ্য আর কিছুই ছিলোনা। তাছাড়া আজকালকার দুনিয়ায় বিভিন্ন দাওয়াতের প্রচার প্রসার এবং জনগণকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার কাজে যেসব কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে, আমাদের গৃহীত কর্মপদ্ধতিতে তার কিছুই ছিলোনা।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখে আমাদের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে যে, আল্লাহর বান্দারা প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যায় আমাদের দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আমাদের নিরস বৈঠকগুলোতে না ডাকলেও তারা দূর দূরান্ত থেকে এসে অংশগ্রহণ করছে। এ আকর্ষণ যে সত্যেরই আকর্ষণ, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা আমাদের কাছে সত্য ছাড়া আর কোনো আকর্ষণকারী জিনিস নেই।

আমাদের এসব সভা ও বৈঠকের উদ্দেশ্য কোনো শোভাযাত্রা বা হৈ হাংগামা করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এইযে, আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হবো, পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়াবো, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হবো, কেউ কারো অজানা অচেনা ও পর থাকবোনা। পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতার উপায় খুঁজে বের করবো এবং কিভাবে কাজ এগিয়ে নেয়া যায়, পথের বাধাবিঘ্ন অপসারণ করা যায় এবং সমস্যাবলীর সমাধান করা যায়, সেই পন্থাও উদ্ভাবন করবো। তাছাড়া এসব বৈঠকে আমরা আমাদের কাজের পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই, কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি বুঝতে পারি এবং তা দূর করার সুযোগ লাভ করি। এছাড়া যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আমাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত অথবা আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সন্ধিহান তারাও এই বৈঠকের মাধ্যমে সরাসরি আলাপ আলোচনা করে আমাদের দাওয়াত ও কার্যক্রমকে বুঝে নিতে পারেন। অতঃপর তাদের বিবেক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা হক পথে আছি তাহলে আমাদের দলে যোগ দেবেন। অনেক সময় কেবল

দূরত্বের কারণেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। শুধু ঘনিষ্ঠতা, প্রত্যক্ষ দর্শন, সাক্ষাত ও ব্যক্তিগত সম্পর্কই (Personal Contact) এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে পারে। আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করি আর সেসব সম্মানিত সুধীজনকেও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করে আমাদের এই বৈঠকগুলোতে কেবল আমাদের বক্তব্য জানবার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন। যেখানে চিত্ত বিনোদনের কোনো সামগ্রী নেই সেখানে তারা শুধু এজন্য আসেন যে, আল্লাহর কতক বান্দা আল্লাহর নাম নিয়ে যে কাজ করছে তা কতটা আল্লাহর কাজ এবং সেটা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত কিনা– তা অনুসন্ধান করবেন। তাদের এই সত্যসন্ধানী মানসিকতাকে আমরা পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। তাঁদের এই আন্তরিকতাপূর্ণ সত্যনুসন্ধান যদি মনমগজের পরিচ্ছন্নতা তথা পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে পরিচালিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাদের চেষ্টা সাধনা ও অনুসন্ধানকে ব্যর্থ হতে দেবেন না এবং তাদের সত্য পথের সন্ধান অবশ্যই দেবেন।

যেহেতু এখানে যারা সমবেত হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দাওয়াত ও আমাদের উদ্দেশ্য কি এবং আমরা কি উপায়ে তা সফল করতে চাই– তা জানতে ইচ্ছুক, তাই আমি সর্বপ্রথম এ দু'টি বিষয়েই কিছু বক্তব্য রাখবো।

আমাদের দাওয়াত কী?

আমাদের দাওয়াত সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আমরা হুকুমাতে ইলাহিয়া তথা খোদায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। খোদায়ী রাষ্ট্র কথাগুলো একেতো আপনা থেকেই খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তদুপরি তাকে খানিকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির হাতিয়ার বানানো হয়ে থাকে। লোকেরা মনে করে এবং তাদের এরূপ ধারণা দেয়াও হয়ে থাকে যে, খোদায়ী রাষ্ট্র দ্বারা নিছক একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বুঝানো হয়ে থাকে এবং বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থলে সেই বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আর কিছু আমাদের কাম্য নয়। আর যেহেতু অনিবার্যভাবে সেসব মুসলমানই এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালক বা শাসক হবে যারা তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে; সুতরাং এই ধারণা থেকে আপনা আপনিই এই অর্থ বেরিয়ে আসে অথবা চালাকীর সাথে বের করা হয় যে, আমরা কেবল গদি চাই। এরপর শুরু হয়ে যায় ধর্মীয় ওয়ায নসীহত। আমাদের বলা হয়, তোমরা তো কেবল দুনিয়াদারীর ধান্ধায় আছো, অথচ প্রত্যেক মুসলমানের ঐকান্তিক লক্ষ্য হওয়া

উচিত দীন ও আখিরাত। সরকার তো চাওয়ার জিনিস নয় বরং একটা পুরস্কার যা দীনদার সুলভ জীবন যাপনের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর কাছ থেকে এমনিতেই পাওয়া যায়। এ ধরনের কথাবার্তা কোথাও কোথাও নিছক নির্বুদ্ধিতার কারণে বলা হয়। আবার কোথাও কোথাও তা বলা হয় খুবই ধূর্তামির সাথে শুধু এই উদ্দেশ্য যে, এ কাজ থেকে আমাদের ফেরানো না গেলেও অন্তত জনসাধারণের একটি বিরাট অংশকে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করা যাবে। অথচ কেউ যদি মুক্ত মন নিয়ে আমাদের পুস্তকাদি পড়েন তবে তিনি সহজেই বুঝতে পারেন যে, শুধু একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানব জীবনে তথা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন করা, যা ইসলাম সাধন করতে চায় এবং যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া এ দাওয়াত দেয়া ও সংগ্রাম করার জন্য আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালামের নেতৃত্বে সবসময় মুসলিম উম্মাহ নামে একটি মানব গোষ্ঠী গঠিত হয়ে এসেছে।

ইসলামী দাওয়াতের তিনটে মূল কথা

আমরা যদি আমাদের দাওয়াতকে সংক্ষেপে সোজা ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করতে চাই, তবে তা হবে তিনটে মৌল বিষয়ের (Points) সমষ্টি। যথা ঃ

এক. আমরা সাধারণভাবে আল্লাহর সকল বান্দাকে এবং বিশেষভাবে যারা আগে থেকে মুসলমান আছেন তাদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান জানাই।

দুই. যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করার বা ইসলামকে মেনে চলার দাবি করবেন বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করবেন তাকে আমরা আহ্বান জানাই, আপনি নিজের জীবন থেকে মুনাফিকী ও স্ববিরোধিতা পরিহার করুন। আপনি যখন মুসলমান হয়েছেন বা মুসলমানরূপে বহাল আছেন, তখন খাঁটি ও একনিষ্ঠ মুসলমান হোন এবং নিজের গোটা জীবন ও সমগ্র সত্তাকে ইসলামের রং-এ রঞ্জিত করুন।

তিন. দুনিয়ার সামগ্রিক ব্যবস্থা যা আজ বাতিলপন্থী, ফাসিক, পাপাচারী, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে চলছে এবং দুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার যে চাবিকাঠি খোদাদ্রোহীদের কব্জায় রয়েছে, আমাদের আহ্বান হলো, এ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর তত্ত্ব ও বাস্তব উভয়দিক থেকে সৎ, যোগ্য ও ন্যায় পরায়ণ মুমিন লোকদের হাতে অর্পণ করতে হবে।

এই তিনটে বিষয় যদিও একেবারেই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী তা উদাসীনতা ও বিভ্রান্তির আবরণে আচ্ছাদিত ছিলো। তাই আজ শুধু অমুসলিমদের কাছেই নয়, বরং মুসলমানদের কাছেও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আল্লাহর দাসত্বের অর্থ কী?

আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের অর্থ শুধু এতোটুকুই নয় যে, আল্লাহকে আল্লাহ এবং নিজেকে তাঁর বান্দা ও দাস মেনে নেয়া হবে আর চরিত্র, দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও সামষ্টিক জীবন সবই আল্লাহকে না মানা ও তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি না দেয়া অবস্থায় যেমন ছিলো, তেমনই থেকে যাবে। আল্লাহর দাসত্বের অর্থ এটাও নয় যে, আল্লাহকে অতি প্রাকৃতিকভাবে স্রষ্টা, জীবিকাদাতা ও উপাস্য মানা হবে, কিন্তু নিজেদের বাস্তব জীবনের কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে তাকে বেদখল করে দেয়া হবে। আল্লাহর গোলামীর অর্থ এও নয় যে, জীবনকে ধর্মীয় ও জাগতিক এই দু'ভাগে ভাগ করা হবে। অতঃপর যে ভাগটিকে আকীদা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদত উপাসনা এবং হালাল-হারামের কয়েকটি সীমিত বিধি নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়, শুধু সেই ভাগেই তথা ধর্মীয় জীবনেই আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করা হবে। পক্ষান্তরে জাগতিক দিক যা কিনা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত, সে ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব থেকে একেবারেই মুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে সে নিজেই নিজের জন্য জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি বানিয়ে নেবে, বা অন্য কারো রচিত বিধানকে গ্রহণ করবে।

আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের এসব ক'টি অর্থকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত মনে করি। আমরা এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চাই। কুফরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই যতোখানি জোরদার ও তীব্র, বন্দেগী ও দাসত্বের এসব অর্থের বিরুদ্ধেও ঠিক ততোখানি বরং তার চেয়েও দুর্বার ও অপোষহীন। কেননা এর কারণে দীন ইসলাম সংক্রান্ত ধারণাই বিকৃত হয়ে গেছে। আমাদের অকাট্য বিশ্বাস হলো, কুরআন ও তার পূর্বেকার সকল আসমানী গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ও তার পূর্বে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আগত সকল নবী ও রসূল সর্ব সম্মতভাবে আল্লাহর যে দাসত্ব ও বন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা ছিলো এইযে, মানুষ আল্লাহকে পূর্ণাংগ অর্থে ইলাহ, রব, মা'বুদ, সার্বভৌম শাসক, মনিব, মালিক, পথ প্রদর্শক, আইন দাতা, হিসাব গ্রহণকারী ও কর্মফল প্রদানকারী হিসেবে মেনে নেবে। অতঃপর নিজের গোটা জীবনকে চাই তা ব্যক্তিগত জীবন (Private) হোক কিংবা সামষ্টিক ও সামাজিক, নৈতিক

হোক বা ধর্মীয়, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক হোক অথবা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সেই একক ও সর্বময় প্রভু আল্লাহর দাসত্বে সমর্পণ করে দেবে। আল কুরআনে ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً – "তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো"[১] এই কথাটার মাধ্যমে উক্ত দাবিই জানানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা জীবনের কোনো দিক ও বিভাগকেই আল্লাহর ইবাদত, বন্দেগী ও দাসত্ব থেকে মুক্ত (Reserve) রেখোনা। জীবনের সমগ্র দিক ও সমগ্র সত্তাকে নিয়ে আল্লাহর গোলামী ও আনুগত্যের আওতায় চলে এসো। জীবনের কোনো বিষয়কেই আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন মনে করোনা এবং তাঁর হিদায়াত ও পথ নির্দেশনাকে নিস্প্রয়োজন ভেবোনা। তাঁর মুকাবিলায় সেচ্ছাচারী হয়ে অথবা কোনো সেচ্ছাচারী ও অবাধ্য লোকের অনুসারী ও অনুগত হয়ে এমন পথ অনুসরণ করোনা, যে পথ স্বয়ং আল্লাহ্ প্রদর্শন করেননি। বন্দেগী ও দাসত্ব বলতে আমরা এটাই বুঝি, এটাই প্রচার করি এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে এটাই গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

মুনাফিকীর স্বরূপ

দ্বিতীয় যে জিনিসটির আমরা আহ্বান জানাই তা হলো, আপনারা যারা ইসলামের অনুসারী হবার দাবি করছেন অথবা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আপনারা মুনাফিক সুলভ আচরণ পরিত্যাগ করুন এবং নিজেদের জীবনকে স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত করুন। মানুষ যে জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হবার দাবি করে, সে যদি সেই জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েও সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত থাকে, তাকে পাল্টে তদস্থলে নিজের আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা না করে, রবং ঐ ফাসিকী ও খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থাকে নিজের জন্য উপযোগী বানানো ও তার অধীনে নিজের জন্য আরামদায়ক আবাসস্থল গড়ে তোলার চিন্তায় বিভোর থাকে; সে এই বাতিল ব্যবস্থাকে পাল্টাবার চেষ্টা করলেও উক্ত পাপাচারমূলক জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দীন কায়েম হোক এই লক্ষ্য তার থাকেনা, বরং একটা ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে আর একটা ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থা তদস্থলে চালু হয়ে যাক এই চেষ্টাই সে করে। কোনো ব্যক্তির এই ভূমিকা ও আচরণকেই আমরা মুনাফিকী তথা মুনাফিকসুলভ আচরণ বলে থাকি। আমাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ মুনাফিক সুলভ আচরণ, আগাগোড়া কপটতা, শঠতা ও ভন্ডামী। কেননা একটা জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী থাকা আর তার বিপরীত অন্য একটা জীবন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা একেবারেই পরস্পর বিরোধী ব্যাপার।

---

১. সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮।

খালিস ও একনিষ্ঠ ঈমানের সর্বপ্রথম দাবি হলো, যে জীবন ব্যবস্থার প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে তাকেই আমরা নিজেদের জীবনের জন্য পালনীয় আইন ও বিধান হিসেবে চালু দেখতে চাইবো এবং এই আইন ও বিধান অনুসারে জীবন যাপনের পথে কোনো কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের অন্তরাত্মা বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠবে। ঈমান এমন জিনিস যা তার পথে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাধাকেও বরদাশত করেনা, আর গোটা দীন অন্য একটা ব্যবস্থার অসহায় তাবেদার হয়ে পড়বে এটা তো সহ্য করার প্রশ্নই ওঠেনা। অন্য ব্যবস্থার তাবেদার হয়ে যদিও বা কোথাও ইসলামের অংশ বিশেষ চালু থাকে তবে তার কারণ শুধু এইযে, বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ঐ অংশ বা অংশগুলোকে নিজের জন্যে অক্ষতিকর ও নিরাপদ মনে করে অনুগ্রহপূর্বক বহাল রেখেছে। আর এই অনুগৃহীত কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া জীবনের বাদবাকী সকল দিক, বিভাগ ও কর্মকাণ্ডকে ইসলামের ভিত্তিতে নয় বরং উক্ত বিজয়ী বাতিল ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে তোলে। এরূপ পরিস্থিতিতেও যার ঈমান সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে এবং সে যা কিছু চিন্তা করে প্রচলিত কুফরী ব্যবস্থার আধিপত্যকে সর্বসম্মত মূলনীতি হিসেবে মেনে নিয়েই চিন্তা করে, তার এ ধরনের ঈমান ফিক্হ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে যতই গ্রহণযোগ্য হোকনা কেন, ইসলামী আদর্শ ও চেতনার আলোকে তাতে আর মুনাফিকীতে কোনোই পার্থক্য নেই। বরং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকী। আল্লাহর দাসত্বের যে ব্যাখ্যা আমি এইমাত্র করলাম, তদানুসারে নিজেরদেকে এক আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের অধীনে সোপর্দ করার অংগীকার যারা করে, তাদের জীবন এই মুনাফিকী থেকে মুক্ত হোক এটাই আমাদের কাম্য।

আল্লাহর দাসত্বের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে আমাদের সাচ্চা দিলে এই কামনা করা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যে জীবন যাপন পদ্ধতি, যে বিধিবিধান এবং সমাজ, সভ্যতা, নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের যে নীতিমালা দিয়েছেন, আমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড যেনো সে অনুসারেই চলে। আমাদের জীবনের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভাগেও যেনো আমরা এই সত্য ও সঠিক বিধানের পরিপন্থী অন্য কোনো বিধানের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বরদাশত করতে প্রস্তুত না হই। এখন তাহলে আপনি নিজেই বুঝে নিন, বাতিল ব্যবস্থার আধিপত্য বরদাশত করাও যখন ঈমানের দাবির পরিপন্থী, তখন তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকা এবং তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য চেষ্টা করা, কিংবা এক বাতিল ব্যবস্থার স্থলে আরেক বাতিল ব্যবস্থাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা ঈমানের সাথে কিভাবে মানানসই ও সংগতিশীল হতে পারে?

স্ববিরোধিতা বলতে কী বুঝায়?

মুনাফিকীর পর দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে আমরা পুরানো ও নতুন মুসলমানদের জীবন থেকে দূর করতে চাই এবং মুমিন মুসলমান বলে পরিচয় দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা দূর করার আহ্বান জানাই, তা হলো স্ববিরোধিতা। মানুষ মুখে যা দাবি করে, কাজে তার বিরুদ্ধাচারণ করলে তাকেই আমরা স্ববিরোধীতা বলি। অনুরূপভাবে কোনো মানুষ যখন এক ক্ষেত্রে এক রকম এবং অন্য ক্ষেত্রে আর এক রকম কাজ করে, তখন তাকেও স্ববিরোধিতা বলা হয়। তাই কেউ যদি দাবি করে যে, সে তার গোটা জীবনকে আল্লাহর দাসত্বে বিলীন করে দিয়েছে, তাহলে তার সচেতনভাবে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা আল্লাহর দাসত্ব ও অনুগত্যের বিরোধী। আর যদি মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ এ ধরনের কোনো কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তার নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। পুরো জীবনটাকে আল্লাহর রং-এ রঞ্জিত করা বা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলা ও পরিচালিত করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। দু'মুখো নীতি ও আচরণ ঈমানের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়। আমরা একদিকে আল্লাহ আখিরাত, ওহী, নবূয়্যত ও শরীয়ত মানি বলে দাবি করবো, আর অপরদিকে দুনিয়ার লোভের বশবর্তী হয়ে এমনসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবো, অন্যদেরকে ভর্তি হতে উৎসাহিত করবো এবং নিজেদের উদ্যোগে এমনসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবো যেখানে মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার, আখিরাতকে ভুলে যাওয়ার এবং বস্তুবাদ ও ভোগবাদে আপাদমস্তক ডুবে থাকার শিক্ষা দেয়া হয়। একদিকে আমরা আল্লাহর আইন মানি বলে দাবি করবো, আর অপরদিকে যেসব আদালত আল্লাহর আইনকে আদালতের চৌহদ্দী থেকে বেদখল করে খোদা বিমুখ আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেসব আদালতের উকিল ও বিচারক হবো এবং সেসব আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সত্য অসত্য নির্ণয় করবো। একদিকে আমরা মসজিদে গিয়ে গিয়ে জামায়াতে নামাযও পড়বো, আবার অন্যদিকে মসজিদ থেকে বের হওয়া মাত্রই নিজের পারিবারিক জীবনে, লেনদেনে, জীবিকা উপার্জনে, বিয়ে শাদীতে, উত্তরাধিকার বন্টনে, রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কায়কারবারে আল্লাহ ও তাঁর শরীয়তের বিধিকে ভুলে কোথাও নিজের প্রবৃত্তির আইন, কোথাও প্রচলিত সামাজিক ও দেশীয় প্রথা এবং কোথাও খোদাবিমুখ শাসকদের তৈরি আইন মেনে চলতে থাকবো। একদিকে আমরা আমাদের খোদাকে বারবার আশ্বাস দেবো যে, আমরা তোমারই বান্দা, তোমারই দাসত্ব ও ইবাদাত করছি, আর অপরদিকে আমাদের মনোমুগ্ধতা, আমাদের প্রীতি ভালোবাসা ও আমাদের

আরাম আয়েশের সাথে কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখে এমন প্রতিটি বস্তু আমাদের দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে এবং আমরা তার পূজা করতে লেগে যাবো এ সবই স্ববিরোধিতা। এ ধরনের অসংখ্য স্ববিরোধী তথা দু'মুখো নীতি ও আচরণ আজকাল মুসলমানদের জীবনে শেকড় গেড়ে বসেছে। এ সত্যটাকে কোনো চক্ষুস্মান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেনা। আমাদের দৃষ্টিতে এসব স্ববিরোধী আচরণ ও মানসিকতাই আসলে মুসলমানদের চরিত্র ও আখলাককে এবং তাদের দীন ও ঈমানকে ঘুনের মত ভেতরে ভেতরে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। আজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও অংগনে মুসলমানদের যে চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে এই স্ববিরোধিতাই তার মূল কারণ। দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যখন মুখ দিয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছ এবং নামায রোযা ইত্যাকার ধর্মীয় কাজকর্ম করছ, তখন আর ভয় নেই। তোমাদের কাজ কর্ম যতই ইসলাম বিরোধী ও ঈমান বিরোধী হোকনা কেন, তোমাদের ইসলামে কোনো ক্রমেই কোনো খুঁত বা ক্রুটি দেখা দেবেনা। তোমাদের পরকালের মুক্তির পথে কোনোই বাধা আসবেনা। শেষ পর্যন্ত এই শৈথিল্য এতদূর গড়ালো যে, নামায রোযাও আর মুসলমান হওয়ার শর্ত রইলোনা। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এরূপ ধারণার প্রচলন ঘটানো হলো যে, একদিকে যদি ঈমান ও ইসলামের মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং অপরদিকে গোটা জীবনও যদি তার বিপরীত চলে, তবে তাতেও কিছু আসে যায়না। এ যেনো সেই ইহুদী মানসিকতারই নবরূপে আত্মপ্রকাশ যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে, "আগুন আমাদেরকে মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিনই স্পর্শ করবে।"

এই মানসিকতারই ফল দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের সাথে সব রকমের পাপাচার, কুফরী, নাফরমানী, খোদাদ্রোহিতা ও যুলুমের সহাবস্থান চলছে। মুসলমানরা একথা বুঝতেই সক্ষম হচ্ছেনা যে, তারা যে পথে নিজেদের সময়, শ্রম, সম্পদ, শক্তি ও যোগ্যতাকে খাটাচ্ছে, যে পন্থা ও পদ্ধতিতে নিজেদের গোটা জীবনকে ব্যয় করছে এবং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পেছনে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করছে, তার অধিকাংশই তাদের ঈমানের দাবির পরিপন্থী। যতোদিন এই পরিস্থিতি বহাল থাকবে, ততদিন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণেও কোনো লাভ হবেনা। কেননা লবণের খনিতে যাই পড়ুক তা যেমন লবণে পরিণত হয়ে যায়, তেমনি এই স্ববিরোধিতার খনিতে নতুন যারা আসবে, তারাও একই রকম স্ববিরোধী মুসলমানেই পরিণত হবে। সুতরাং আমাদের দাওয়াতের একটি অপরিহার্য অংশ এইযে, যারা নিজেদের মুমিন বলে দাবি করেন তাদের প্রত্যেককে আমরা এসব স্ববিরোধী আচরণ

থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে আহ্বান জানাই। প্রত্যেক মুমিনের কাছে আমাদের দাবি হলো, তিনি যেনো একনিষ্ঠ ও একমুখী হন। তার গোটা জীবন ও কর্ম যেনো ঈমান ও ইসলামের অবিমিশ্র রং-এ রঞ্জিত হয়। ঈমানের বিপরীত এবং মুসলমান সুলভ জীবন পদ্ধতির পরিপন্থী হয়, এমন প্রতিটি জিনিস থেকে যেনো তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাৎক্ষণিকভাবে ছিন্ন করতে না পারলেও ছিন্ন করার চেষ্টা যেনো ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যান। তিনি যেনো ঈমানের প্রতিটি দাবি অনুধাবন করেন এবং তা পূরণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

নেতৃত্ব পরিবর্তনের আবশ্যকতা

এবার আমাদের দাওয়াতের তৃতীয় দফাটির প্রতি মনোযোগ দিন। যে দু'টি দফা আমি এইমাত্র আপনাদের কাছে বিশ্লেষণ করলাম এই তৃতীয় দফাটি ঐ দু'টি দফার ঠিক স্বাভাবিক ফল হিসেবে বেরিয়ে আসে। আমরা যদি নিজেদেরকে সর্বোতভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে নিয়োজিত করি আর এ কাজে আমরা মুনাফিক তথা কপট ও দ্বিমুখী না হয়ে একনিষ্ঠ ও একমুখী মুসলমান হবার চেষ্টা করি, তাহলে এর অনিবার্য ফল ও দাবি এই দাঁড়াবে যে, আমরা প্রচলিত জীবন ব্যবস্থায় বিপ্লব তথা এর আমূল পরিবর্তন চাইবো। যে সমাজ ও সভ্যতা কুফরী, নাস্তিকতা, শিরক, পাপাচার, অনাচার ও চরিত্রহীনতার ভিত্তিতে চলছে এবং যার পরিকল্পনাকারী ও যার বাস্তব রূপকার, পরিচালক ও শাসকগণ আল্লাহ বিমুখ ও তাঁর শরীয়তের অবাধ্য, সেই সমাজ ও সভ্যতায় আমরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন কামনা করবো। কেননা যতোদিন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে থাকবে এবং যতোদিন জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষাদীক্ষা, প্রচার ও প্রকাশনা, আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগ, অর্থনীতি, শিল্প, প্রযুক্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক– এ সবকিছুর বাগডোর তাদের হাতে থাকবে, ততোদিন দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তির শুধু যে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যকে নিজের জীবনবিধি হিসেবে চালু রাখা কার্যত অসম্ভব তা নয়, বরং সেইসাথে নিজের পরবর্তী বংশধরদেরও আকীদাগতভাবে ইসলামের অনুসারী বানিয়ে রেখে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া যে ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর দাস হয় তার অন্যান্য ফরয কাজ ছাড়াও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ এই হয় যে, সে দুনিয়ার শাসন ব্যবস্থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দাবি অনুযায়ী বিকৃতি ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করবে এবং সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। আর একটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সৎ লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত না হওয়া পর্যন্ত এবং অসৎ, পাপাচারী, খোদাদ্রোহী ও শয়তানের অনুগত লোকেরা দুনিয়ার নেতা, শাসক ও প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। দুনিয়ায় অসৎ লোকদের শাসন

চালু থাকবে অথচ তার পরও দুনিয়ায় জুলুম, অনাচার, দুর্নীতি, গোমরাহী ও চরিত্রহীনতার সয়লাব বয়ে যাবে না, এটা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অস্বাভাবিক। তাছাড়া অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারাও আজকাল সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এমনটি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমাদের মুসলমান হওয়ার স্বতস্ফূর্ত দাবি হলো, দুনিয়ার যাবতীয় গোমরাহী ও বিপথগামীতার যারা পথ প্রদর্শক, পরিচালক ও নেতা, তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটাতে হবে এবং কুফরী ও শিরকের বিজয়কে খতম করে তার স্থলে আল্লাহর সত্য দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাতে হবে।

নেতৃত্ব বিপ্লব কিভাবে সাধিত হয়?

কিন্তু এই বিপ্লব, এই সর্বাত্মক ও আমূল পরিবর্তন চাইলেই হয়ে যাবে এটা সম্ভব নয়। বিশ্ব নিখিলে আল্লাহর যে নিয়ম ও বিধান চালু আছে তা সর্বাবস্থায় এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় যে, দুনিয়াটা সুষ্ঠুভাবে শাসিত ও পরিচালিত হবে। আর দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা ও শাসনের জন্য কিছু যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা ও মানবীয় গুণাবলীর প্রয়োজন, যা অর্জিত না হলে কোনো দল বা গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার এবং তা পরিচালনার উপযুক্ত হতে পারেনা। দক্ষ মুমিনদের এমন একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠী যদি বিদ্যমান না থাকে, যারা দুনিয়ার শাসন কার্য পরিচালনা করার যোগ্যতা সম্পন্ন, তবে আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনা নীতি অমুমিন ও অসৎ লোকদের হাতেই পৃথিবীর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব সমর্পণ করে থাকে। কিন্তু এমন একটি গোষ্ঠী যদি বিদ্যমান থাকে যাদের ঈমানও আছে, সততাও আছে, তদুপরি দুনিয়ার শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীতেও তারা কাফেরদের চেয়ে অগ্রগামী, তাহলে আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনা নীতি যুলুমবাজও নয় এবং নৈরাজ্য প্রিয়ও নয় যে, এর পরও দুনিয়ার শাসন ব্যবস্থাটাকে কাফির ফাসিক ও অসৎ লোকদের হাতেই থাকতে দেবে। কাজেই আমাদের দাওয়াত শুধু এতটুকুই নয় যে, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে সৎ মুমিন লোকদের হাতে চলে আসুক, বরং এই ইতিবাচক বক্তব্যও আমাদের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত যে, সৎ মুমিনদের এমন একদল লোককে সংঘবদ্ধ হতে হবে, যারা ঈমানে সাচ্চা ও পাক্কা, ইসলামে একনিষ্ঠ, একমুখী ও নির্ভেজাল এবং চরিত্রে সৎ ও পবিত্র তো হবেই, তদুপরি দুনিয়ার বাস্তব কর্মক্ষেত্রকে সর্বোত্তম পন্থায় পরিচালনা করতে যেসব গুণাবলী ও যোগ্যতা আবশ্যক তারও তারা অধিকারী হবে। আর ঐসব গুণ ও যোগ্যতার শুধু অধিকারীই তারা হবেনা, বরং ওগুলোতে তারা নিজেদেরকে বর্তমান শাসক ও পরিচালকদের চেয়েও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করবে।

বিরোধীতা ও তার কারণ

এ হচ্ছে আমাদের দাওয়াতের সার কথা। এখন একথা শুনে আপনারা অবাক না হয়ে পারবেন না যে, এই দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিরোধ যদি কারো পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তা মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। এখন পর্যন্ত অমুসলিমদের পক্ষ থেকে না আমাদের বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ উঠেছে আর না গড়ে উঠেছে কোনো কার্যকর বিরোধিতা ও প্রতিরোধ।[১] আমরা জানিনা, ভবিষ্যতেও এই অবস্থা বহাল থাকবে কিনা? আর কতদিন এ অবস্থা থাকবে, তাও অনুমান করতে পারিনা। তবে সে যাই হোক, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও পরিতাপ জনক ব্যাপার যে, এই দাওয়াত শোনার পর ভ্রু কোচকানো, একে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক মনে করা এবং এর প্রতিরোধে সবার আগে সচেষ্ট হওয়া মানুষগুলো অমুসলিম নয়, বরং মুসলমান। সম্ভবত এ রকমের পরিস্থিতিতেই আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে কুরআনে বলা হয়েছিলো, “তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়োনা।”

আমরা হিন্দু, শিখ ও ইংরেজদের সাথে পর্যন্ত মত বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এমন খুব কমই হয়েছে যে, তাদের কেউ আমাদের বই পুস্তক পড়ে বা আমাদের বক্তব্য বিশদভাবে আমাদের মুখ থেকে শুনে একে “সঠিক নয়” বা “ন্যায়সংগত নয়” বলে রায় দিয়েছে। অথবা আমরা ইসলাম কায়েমের চেষ্টা চালালে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তা প্রতিহত করবে বলে হুমকি দিয়েছে। বরঞ্চ একাধিক অমুসলিমকে আমরা স্বতস্ফুর্তভাবে এরূপ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতে দেখেছি যে, আহা! যদি এই ইসলামই ভারতে প্রচার করা হতো আর এই ইসলামকে কায়েম করার জন্যই বহিরাগত মুসলমানরা এবং ভারতের ইসলাম গ্রহণকারীরা চেষ্টা চালাতো, তাহলে আজ ভারতের মানচিত্র এবং ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতো। এমনকি কোনো কোনো অমুসলিম আমাদেরকে এ কথাও বলেছে যে, “বাস্তবিক পক্ষে যদি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের এই মূলনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে চলবে এবং যার বাঁচা ও মরা এই একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, তাহলে সেই সমাজের সদস্য হতে আমাদের কোনোই আপত্তি থাকবেনা।” অথচ আমাদের বিরোধিতায় আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ের ধুম্রজাল সৃষ্টিতে এবং সব রকমের অভিযোগ ও কুৎসা রটনায় কেউ যদি সর্ব প্রথম তৎপর হয়ে উঠে থাকে, তবে মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীই হয়েছে। আর এদের মধ্যেও সবচেয় বেশী কৃতিত্ব ধর্মীয় নেতারাই দেখিয়েছেন।

---

১. উল্লেখ্য যে, এ বক্তব্য ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বেকার অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

আরো মজার ব্যাপার হলো, আজ পর্যন্ত কেউ একথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি যে, তোমরা যে দাওয়াত দিচ্ছ তা অন্যায় বা ভ্রান্ত। সম্ভবত এ দাওয়াতের ওপর সম্মুখ দিক থেকে আক্রমণ করা (Frontal attack) আদৌ সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়ে কখনো পেছন দিক থেকে, কখনো ডান দিক থেকে এবং কখনো বাম দিক থেকে চোরা গোপ্তা আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কখনো বলা হয়, দাওয়াতটা তো সঠিক, কিন্তু দাওয়াত যারা দিচ্ছে তাদের নানা রকম ত্রুটি রয়েছে। কখনো বলা হয়, এ দাওয়াত যে সত্য ও সঠিক, সে ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে এ যুগে এটা অচল। কখনো বলা হয়, এটাই তো সঠিক জিনিস, কিন্তু এর পতাকা বহন ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের মত লোকের দরকার। সে নেতৃত্ব এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কখনো বলা হয়, এ দাওয়াত যে সত্য, তাতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই; কিন্তু মুসলমানরা বর্তমানে যেরূপ আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার তাতে এই দাওয়াতকে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রতে পরিণত করা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? তা করলে তাদের দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রকে বাতিলপন্থীরা দখল করে তাদের বাঁচার পথ পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেবে।

এরপর যখন এ মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর এমন কোনো বান্দার আবির্ভাব ঘটে, যে আমাদের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করে নিজের জীবনকে যথার্থই মুনাফিকী, ও স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে এবং নিজের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যে বিলীন করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তার বিরোধিতা করার জন্য তার নিজের ভাই বেরাদার, মা বাবা, আত্মীয় স্বজন, গোত্রগোষ্ঠী ও বন্ধুবান্ধবই সর্ব প্রথম এগিয়ে আসে। বড় বড় পরহেজগার ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, যাদের কপালে নামায পড়তে পড়তে দাগ বসে গেছে এবং যাদের মুখে হর হামেশা ধর্মীয় কথাবার্তা লেগেই থাকে, তারা পর্যন্ত এটা সহ্য করতে প্রস্তুত নন যে, তাদের ছেলে, ভাই বা অন্য কোনো প্রিয়জন এই বিপজ্জনক কাজে যোগ দিক। কারণ তারা তার দ্বারা কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করতে কোনো না কোনো পর্যায়ে উৎসুক থাকেন।

পূর্ণাংগ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই আহ্বানের বিরোধিতা যে সর্বপ্রথম মুসলমানগণ করেছে এবং তাদের মধ্য থেকেও দুনিয়াদাররা নয়, বরং দীনদার ও ধর্মপ্রাণ লোকেরাই করছে এটা একটা গুরুতর ব্যাধির লক্ষণ। এ ব্যাধিটা দীর্ঘকাল ধরে লালিত পালিত হয়ে এসেছে। আজ আমরা যদি কেবল তাত্ত্বিকভাবে এই দাওয়াত পেশ করতাম এবং এ কথা না বলতাম যে ঃ 'আসুন আমরা এই দাওয়াতকে কার্যকর করি ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাই', তাহলে

আপনারা দেখতে পেতেন, এসব মজাদার তাত্ত্বিক বক্তব্যের জন্য আমাদের কাছে চারদিক থেকে কেবল অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী আসতো। কোনো মুসলমানের কি এতদূর অধোপতন হতে পারে যে, সে বলবে আনুগত্য ও দাসত্ব আল্লাহ ছাড়া অপর কারো হওয়া উচিত? মুসলমানদের মুনাফিক সুলভ চালচলন এবং ঈমান বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া উচতি? এমন একজন মুসলমানেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যিনি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলানদের পরিবর্তে অমুসলিম বা খোদাদ্রোহীদের হাতে তুলে দেয়ার এবং দেশে ইসলামী আইনের পরিবর্তে কুফরী আইন চালু থাকতে দেয়ার পক্ষপাতী। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এ যাবত আমরা যেসব জিনিসের দাওয়াত দিয়েছি তার মধ্যে একটিও এমন নেই যাকে আমরা কার্যকর করার আহ্বান না জানিয়ে কেবল তাত্ত্বিকভাবে পেশ করলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে টুশব্দটিও করতে প্রস্তুত হতো। শুধু একটিমাত্র কারণেই কিছু লোক এর বিরোধিতায় মেতে উঠেছে। সেটি হলো আমরা এসব কথাবার্তা নিছক তাত্ত্বিকভাবে বলা পর্যন্ত ক্ষান্ত না থেকে এই দাবিও কেন জানাই যে, আসুন, যে জিনিসকে আপনি ঈমানের দৃষ্টিতে সত্য বলে জানেন, তাকে প্রথমে নিজের জীবনে এবং তারপর নিজের আশ পাশের পরিবেশে কায়েম ও চালু করার চেষ্টা করুন? রসূল সা.-এর রসূল হিসেবে আবির্ভাবের সময়ও অবিকল এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। যারা আরবের জাহেলী যুগের সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তারা জানেন, রসূল সা.-এর তাওহীদের দাওয়াত ও নৈতিক নীতিমালা আরবে কোনো নতুন জিনিস ছিলোনা। এ ধরনের একত্ববাদী ধ্যান ধারণা জাহেলী যুগের একাধিক কবি ও বাগ্মী আগেই পেশ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলামী নৈতিকতা সংক্রান্ত বক্তব্যেরও বেশীরভাগ কথাই আরব কবি সাহিত্যিকরা আগে থেকেই তুলে ধরছিলেন। পার্থক্য কেবল এতোটুকু ছিলো যে, রসূল সা. একদিকে তো বাতিলের মিশ্রণ থেকে আলাদা করে নির্ভেজাল ও খালিছ ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার আকারে বিন্যস্ত করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছিলেন, অপরদিকে তিনি এই আহ্বানও জানাচ্ছিলেন, আসুন! যে তাওহীদকে আমরা সঠিক জানি তার বিপরীত জিনিসগুলোকে আমরা নিজেদের জীবন থেকে উচ্ছেদ করি এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এই তাওহীদের ভিত্তিতেই গড়ে তুলি; তাছাড়া যে নৈতিক মূলনীতিগুলোকে আমরা সত্যের মাপকাঠি মনে করি আমাদের গোটা জীবন পদ্ধতি সেসব মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলি। এ জন্যই যেসব কথা বলার দরুন জাহেলী যুগের কোনো বক্তা কবি ও বিজ্ঞ লোকের বিরোধিতা করা হয়নি বরং তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, সেসব কথাই যখন রসূল সা. বললেন, অমনি চারদিক থেকে বিরোধিতার ঝড় শুরু হলো। কেননা

শিরকের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে সমূলে উৎখাত করে নতুনভাবে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে এটা মেনে নিতে দেশবাসী কিছুতেই প্রস্তুত ছিলোনা। শত শত বছর ধরে যে কৌলিন্য ও পৈত্রিক রীতি প্রথা, যে আভিজাত্য, বৈষম্য, "বিশেষ অধিকার" ও পদপদবী এবং যে সম্মান, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর জাহেলী যুগের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠেছিলো এবং যার সাথে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রগোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িত ছিলো, সেসবকে ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হবে. এটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে সম্মত ছিলোনা। অনুরূপভাবে লোকেরা এ জন্যও প্রস্তুত ছিলোনা যে, বিকৃত নৈতিক চরিত্রের ব্যাপক প্রচলনের কারণে যে আরাম আয়েশ, আনন্দ, সুযোগ সুবিধা ও অবাধ স্বাধীনতা তারা ভোগ করছিলো তা বিসর্জন দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে সৎ চরিত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। এ অবস্থাটা শুধু রসূল সা.-এর ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়নি বরং তাঁর পূর্বে যতো নবী ও রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদেরও এই একই কারণে বিরোধিতা হয়েছে। নবীগণ যদি নিছক তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক পর্যায়ে তাওহীদ, আখিরাত ও সৎ চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ করতেন তাহলে তাদের আমলে সমাজ শুধু যে তা বরদাশত করতো তা নয়, বরং তাদেরকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করতো ও সাদর অভ্যর্থনা জানাতো। যেমন জনগণ বিভিন্ন ধরনের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের জানিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক নবী তাত্ত্বিক আহ্বানের সাথে সাথে এই দাবীও জানাতেন যে ঃ

اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ–

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মেনে চলো।"[২]

لَا تُطِيْعُوا أَمْرَالْمُسْرِفِيْنَ–

"তোমরা সীমা লংঘন কারীদের আনুগত্য করোনা"।[৩]

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

"তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যে বিধান এসেছে, তাই মেনে চলো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো মনিবের আদেশ মেনোনা।"[৪]

নবীগণ শুধু এই আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য স্বতন্ত্র এক আন্দোলনও চালু করেন। স্বীয় অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করে কার্যত গোটা সভ্যতা সংস্কৃতি ও নৈতিক ব্যবস্থাকে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে পরিবর্তন করার সংগ্রাম শুরু করে দেন। এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়

২. সূরা ২৬, আশ শোয়ারা ঃ ১৫০।
৩. ঐ
৪. সূরা ৭ আল আ'রাফ ঃ ৩।

প্রচলিত জাহেলী ব্যবস্থার সাথে যাদের স্বার্থ সার্বিক বা আংশিকভাবে জড়িত ছিলো, তাদের বিরোধিতা। আজ আমরা দেখতে পাই আমাদেরও বিরোধিতার সূচনা হয়েছে। মুসলমানরা দীর্ঘকাল ধরে শুধু যে জাহেলী ব্যবস্থার সাথে বহু ক্ষেত্রে আপোষ রফা করে চলেছে তা নয়, বরং সেইসব আপোষের ওপর তাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এইসব আপোষ শুধু যে দুনিয়াদারীর পর্যায়ে হচ্ছে তা নয়, বরং তা বেশ খানিকটা ধর্মীয় রূপও পরিগ্রহ করেছে। অত্যন্ত উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ যাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যায়না, তারাও এই সব আপোষের বন্ধনে আবদ্ধ। বাতিল সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরহেজগারী ও ইবাদতের কিছু কিছু বাহ্যিক আলামত যুক্ত করাকে এতটাই যথেষ্ঠ মনে করে নেয়া হয়েছে যে, অনেকে এইসব ইবাদত ও পরহেজগারীর ওপর নির্ভর করেই নিজের আখিরাতের মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। অনেক উঁচু দরের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এমনও রয়েছেন যাদের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় পদমর্যাদা জাহেলী ব্যবস্থার সাথে আপোষ করা সত্ত্বেও বহাল ও অম্লান রয়েছে। মুখে কুফরী, জাহেলিয়াত, পাপাচার, ভ্রান্ত আকীদা ও গোমরাহীর নিন্দা করা এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগের উচ্ছসিত বিবরণ দিয়ে ওয়ায নসীহত করা ইসলামের হক আদায় করার জন্য একেবারেই যথেষ্ঠ মনে করা হচ্ছে। এটুকু করার পর নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তান সন্তুতি, আত্মীয়স্বজন ও অনুসারীদের সেই বাতিল ব্যবস্থার সেবায় নিয়োজিত করা যেনো ঐ মহারথীগণের জন্য একেবারেই বৈধ হয়ে গেছে। অথচ ঐ ব্যবস্থা দেশে গোমরাহীর সয়লাব ও পাপাচারের তাণ্ডব বইয়ে দিয়েছে বলে তারা দিনরাত তার নিন্দা করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা যখন ইসলাম ও তার দাবীকে কেবল তাত্বিকভাবে পেশ করেই ক্ষান্ত থাকিনা বরং এই মর্মে আহ্বানও জানাই যে, ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার সাথে আপনারা যে আপোষ করে রেখেছেন, তা খতম করুন। পূর্ণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সাথে সত্যের অনুসরণ করুন এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তদস্থলে সেই ন্যায় ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য জান মাল, সময় ও শ্রমের সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করুন, যার ওপর আপনারা ঈমান এনেছেন, তখন এটা যেনো আমাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। এখন যদি সোজা সুজিভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সত্যিই ইসলামের দাবী এই এবং ইসলামের একনিষ্ঠ আনুগত্য একেই বলে আর বাস্তাবিক পক্ষে এটাই সত্য যে, বাতিল ব্যবস্থার সাথে মু'মিনের সম্পর্ক কখনো আপোষমূলক হতে পারেনা, বরং সংঘাতমূলকই হতে পারে, তাহলে দু'টি পন্থার মধ্য হতে যে কোন একটি অবলম্বন করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। হয় নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে হয়, যা স্পষ্টতই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

নচেত এ কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, এটাই সত্য কিন্তু আমরা দুর্বলতা বশত এর সাথে সহযোগিতা করতে পারছি না। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি করাও দুসাধ্য ব্যাপার। কেননা এটা করলে এ যাবত আখিরাতের মুক্তির যে গ্যারান্টির ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে আসা হচ্ছিল, সেটা অনিশ্চয়তার কবলে পড়ে যায়। এমনিক তাতে তাঁদের এ যাবতকালের অর্জিত ও উপভোগ করা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মর্যদাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই শেষোক্ত পরিণতিটাও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে একটা বৃহৎ মহল তৃতীয় একটি পন্থা অবলম্বন করছে। সেটি হলো আমাদের দাওয়াতকে খোলাখুলিভাবে ভ্রান্ত না বলা। কেননা ভ্রান্ত বলার আসলেই কোনো অবকাশ নেই। তবে স্পষ্ট ভাষায় তাকে সঠিক বলে মেনে নেয়াকেও উচিত মনে করা হয়না। যদি কোথাও তাকে সঠিক বলে মেনে নেয়ার প্রয়োজন হয়েই পড়ে, তাহলে নীতিগত প্রশ্ন বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অভিযোগ ও অপপ্রচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়। যাতে তারা স্বয়ং যে সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, তার সহযোগিতা না করার বৈধতা প্রমাণ করা যায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, যে যুক্তি প্রমাণ তারা আজ আল্লাহর বান্দাদের মুখ বন্ধ করার জন্য পেশ করে থাকেন, সেই যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তারা কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহর মুখও বন্ধ করতে পারবেন কিনা, সেই কথা তারা কখনো ভেবে দেখেননা।

আমাদের কর্মপদ্ধতি

এবার আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে আমাদের দাওয়াতের জন্য যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা তুলে ধরবো। আসলে আমাদের দাওয়াতের মতো আমাদের কর্মপদ্ধতিও কুরআন এবং নবীগণের কর্মপদ্ধতি থেকেই গৃহীত। যারা আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন তাদের কাছে আমাদের প্রথম দাবী এই হয়ে থাকে যে, নিজেকে কার্যকরভাবে ও সর্বোতভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্যে সোপর্দ করে দিন। নিজের কার্যকলাপ দ্বারা নিজের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ দিন এবং ঈমানের পরিপন্থী হয় এমন যাবতীয় জিনিস থেকে নিজেদের জীবনকে পবিত্র করুন।

এখান থেকেই তাদের চরিত্র গঠন ও পরীক্ষার পালা শুরু হয়। যারা ইতিপূর্বে বড় বড় উচ্চাভিলাষ (Ambitions) নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে নিজেদের স্বপ্নের বড় বড় প্রাসাদ নিজ হাতেই ভেংগে গুড়িয়ে দিতে হয়। এভাবে তাদেরকে সেই জীবন বেছে নিতে হয় যেখানে উচ্চ পদ মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুখ সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নিজ জীবনে তো দূরের কথা দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মেও সুদূর পরাহত। যাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস ছিল কোনো বন্ধক

রাখা বা জবর দখল করা জমি অথবা অন্যের হক নষ্ট করে প্রাপ্ত কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি, তাদেরকে কখনো কখনো সেই সুখ সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করতে হয়। এর একমাত্র কারণ হলো, যে আল্লাহকে তারা নিজেদের মনিব ও প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়েছে তাঁর অনুমতি ব্যাতিরেখে কারো সম্পত্তি ভোগ করা তাদের ঈমানের পরিপন্থী। যাদের জীবিকা উপার্জনের উপায় ছিলো শরীয়া বিরোধী কিংবা অনৈসলামিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত, তাদের পক্ষে উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা, বর্তমান উপার্জন ব্যবস্থা থেকে অর্জিত খাবারের একটি দানা গলধকরণ করাও তাদের পক্ষে নিতান্তই অবাঞ্চিত ও অপছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়। জীবিকার এই উপায়কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পবিত্র ও হালাল উপায়– চাই তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন অবলম্বন করার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করে দেয়। আমি একটু আগেই বলেছি, এই মতাদর্শকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করা মাত্রই মানুষের নিকটতম পরিবেশও তার বৈরী হয়ে যায়। তার পিতামাতা, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও সন্তানেরা এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার ঈমানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরম্ভ করে দেয়। কখনো কখনো এই মতাদর্শের প্রথম আলামত প্রকাশ পাওয়া মাত্রই মানুষের নিজের সেই প্রাণপ্রিয় বাসস্থান– যেখানে সে একদিন অতি আদরে লালিত পালিত হয়েছে– তার জন্য ভীমরুলের চাকে পরিণত হয়।

এ হচ্ছে আমাদের সেই প্রাথমিক প্রশিক্ষণাগার যা সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী কর্মী সরবরাহ করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তৈরী করে দিয়েছেন। এই প্রাথমিক পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয়ে যায় তারা আপনা থেকেই ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায়। আমাদের কষ্ট করে তাদের ছাঁটাই করে দূরে নিক্ষেপ করতে হয়না। আর যারা এতে সফল হয় তারা প্রমাণ করে দেয় যে, তাদের মধ্যে অনন্ততপক্ষে এতোটা নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, আল্লাহ প্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অবশ্যই রয়েছে, যা আল্লাহর পথে চলার জন্য এবং প্রথম পর্বের পরীক্ষায় পাশ করার জন্য প্রয়োজন। এই পর্বে পাশ করা লোকদের আমরা অপেক্ষাকৃত আস্থাশীলতা ও নিশ্চয়তার সাথে দ্বিতীয় পর্বের দিকে নিয়ে যেতে পারি। সেই পর্বে এর চেয়েও বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায়ও আবার সেই পর্যায়ের অচল মুদ্রাগুলোকে ছাঁটাই করে দূরে ফেলে দেয়া হয় এবং খাঁটি সেনাগুলোকে রেখে দেয়া হয়। আমাদের যত দূর জানা আছে, সে অনুসারে নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, মানবীয় উপাদানগুলো থেকে কার্যোপযোগী উপাদানগুলোকে বাছাই করার এবং তাদের অধিকতর কার্যোপযোগী বানানোর জন্য এটাই চিরন্তন প্রক্রিয়া। এসব পরীক্ষাগারে যেটুকু তাকওয়া পরেহজগারী তৈরী হয়, তা ফেকাহ শাস্ত্রীয় ও সুফীবাদী মূল্যায়ণে উত্তীর্ণ না হলেও বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার গুরুভার বহন করার যোগ্যতা কেবল তাতেই তৈরী হয়। খানকায়

তৈরী তাকওয়ার পক্ষে যে আমানতের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের ভার বহন করাও সম্ভব নয়, সেই আমানতের বোঝা বহন করার শক্তিও এই তাকওয়াতেই নিহিত আছে।

এই সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমরা আমাদের জন্য অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করি তা হলো যে সত্যের সন্ধান আমরা নিজেরা পেয়েছি তার সাথে আমাদের নিকটতম পরিবেশকে তথা আমাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদেরও পরিচিত করাবার চেষ্টা করি এবং তাদেরকেও এসত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। এখানে পুনরায় পরীক্ষার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সর্বপ্রথম এর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা হলো এই দাওয়াত ও তাবলীগ তথা ইসলাম প্রচারের কারণে প্রচারকদের নিজের জীবন শুধরে যায়। কেননা এ কাজ শুরু করার মুহূর্ত থেকেই অসংখ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অসংখ্য সার্চ লাইট তার ওপর পড়তে থাকে। ফলে প্রচারকের জীবনে যদি কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসও এমন থাকে যা তার ঈমান ও দাওয়াতের পরিপন্থী, তাহলে এই বিনা বেতনের নিন্দুকগণ তা সুস্পষ্টভাবে প্রচারকের সামনে তুলে ধরে এবং তার বিবেকের ওপর ক্রমাগত কশাঘাত করে তার জীবনকে ঐ ত্রুটি থেকে পবিত্র হতে বাধ্য করে। প্রচারক নিজে যদি সত্যি ঐ দাওয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে ঈমান এনে থাকে, তাহলে সে এসব নিন্দা সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হবেনা এবং নানা রকমের টালবাহানা, ছলছুতো ও অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজের কাজের ত্রুটি গোপন করার চেষ্টা করবেনা। বরং যারা তার সংশোধনের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে চেষ্টা করতে থাকে, তাদের যদি তার বিরোধিতা ও সমালোচনা ছাড়া আর কোনো সদুদ্দেশ্য নাও থেকে থাকে, তবুও তাদের এ কাজকে সে সেবা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তা দ্বারা উপকৃত হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একটি পাত্রকে যদি বহু লোকে ঘষা মাজা করতে লেগে যায় এবং ক্রমাগত তা করতেই থাকে, তাহলে তাতে যতো ধুলোময়লাই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার না হয়েই পারেনা।

তাছাড়া এই দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রমের ফলে এ কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে অনেকগুলো গুণ বিকাশ লাভ করতে থাকে। সেইসব গুণ পরবর্তী সময় অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। প্রচারককে যখন বিভিন্ন রকমের হতোদ্যমকারী পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়, কোথাও তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়। কোথাও তাকে কটু ও অশ্রাব্য বাক্য, গালিগালাজ এবং অন্যান্য অসভ্য অভদ্র ও অশোভন আচরণ সহ্য করতে হয়। কোথাও তার ওপর নানা রকম অপবাদ আরোপ করা হয়। কোথাও তাকে বিভ্রান্তিকর ও ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করার জন্য নিত্য নতুন ফন্দি

আঁটা হয়। কোথাও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তার সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয় এবং তার জন্য তার নিজ পরিমন্ডলে জীবন যাপন দুর্বিষহ করে তোলা হয়। এসব পরিস্থিতিতেও যে কর্মী হতোদ্যম হয়না, সত্য থেকে বিচ্যুত হয়না, বাতিলপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনা এবং উত্তেজিত হয়ে বিবেকের ভারসাম্য হারায়না; বরং প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, অবিচলতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা বজায় রাখে, যথার্থ সত্যনিষ্ঠসূলভ শুভকামনা ও সহানুভূতি সহকারে নিজ লক্ষ্য ও মতাদর্শের ওপর স্থিতিশীল থাকে এবং নিজ পরিবেশকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলী সৃষ্টি হবে এবং বিকাশ লাভ করবে তা সুনিশ্চিত। অতঃপর এসব মহৎ গুণ এই সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে তার জন্যে অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এই দাওয়াত ও তাবলীগ তথা প্রচার কার্যের জন্য আমরা অবিকল সেই কর্মপদ্ধতিই অবলম্বন করেছি, যা কুরআনে শেখানো হয়েছে। সেই কর্মপদ্ধতির মূলকথা হলো, হিকমাত তথা সুক্ষ্মদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতা সহকারে এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতে হবে। পর্যায়ক্রমিক ও স্বভাবসুলভ ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণের কাছে ইসলামের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো পেশ করতে হবে। অতঃপর সেই মূলনীতিগুলোর দাবি ও চাহিদা কি, তা তুলে ধরতে হবে। কাউকে তার জ্ঞান বুদ্ধি ও বোধশক্তির অতিরিক্ত কোনো কথা বুঝাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। খুটিনাটি বিষয়কে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া যাবেনা। মৌলিক ত্রুটিগুলো দূর না করে বাহ্যিক ত্রুটিগুলো শুধরানোর কাজে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। উদাসীন এবং চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত লোকদের সাথে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ না করে চিকিৎসক সুলভ সহানুভূতি ও হিতকামনা সহকারে তাদের চিকিৎসা করাই আমাদের কাজ। গালিগালাজ ও ইঁট পাটকেল খেয়েও আমাদের কল্যাণের দোয়া করা শিখতে হবে। যুলুম নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের সাথে তর্ক, বাহাস এড়িয়ে চলতে হবে। বেহুদা, অশালীন ও অশোভন কথাবার্তা শুনেও না শোনার ভান করতে হবে। মহানুভব লোকদের ন্যায় যথাসম্ভব নীরবে তা সহ্য করতে হবে। যারা সত্য ও ন্যায়ের কোনো ধার ধারেনা এবং তার কোনো প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনা, তাদের পেছনে ছুটা আমাদের কাজ নয়। যাদের মধ্যে কিছু না কিছু সত্যপ্রীতি রয়েছে, তারা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে যতই নগণ্য হোক না কেন, তাদের দিকেই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। দাওয়াতের যাবতীয় চেষ্টা সাধনায় প্রদর্শনেচ্ছা ও

লোক দেখানো মানসিকতা পরিহার করে চলতে হবে। নিজের কৃতিত্ব জাহির করা, গর্বের সাথে তার প্রচার করা এবং নিজের দিকে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা মোটেই করা চলবেনা। বরং প্রতিটি কাজ এই নিয়ত ও বিশ্বাস নিয়ে করতে হবে যে, তার সমস্ত কাজ সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তার সমস্ত তৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনিই সব তৎপরতার সঠিক মূল্যায়ন করবেন। মানুষ তার প্রচেষ্টার মূল্য দিক বা না দিক এবং জনগণের পক্ষ থেকে সে শাস্তি পাক বা পুরস্কৃত হোক তার কোনো পরোয়াই সে করবেনা। এ কর্মপদ্ধতি অসাধারণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম প্রত্যাশা করে। এতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ক্রমাগত কাজ করেও তেমন জাঁকজমকপূর্ণ সাফল্য আসেনা, যেমনটি আসে কোনো ভাসাভাসা ও প্রদর্শনীমূলক কাজে। লোক দেখানো কাজের ক্ষেত্রে তো কাজ শুরুর দ্বিতীয় দিন থেকেই চোখ ধাঁধানো সাফল্য দর্শকদের মনকে মোহিত করতে আরম্ভ করে। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী কাজ করতে থাকার ফলে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে গভীর প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা জন্মে। আর এসব গুণ এ আন্দোলনের পরবর্তী অধিকতর ধৈর্য, শ্রম ও প্রজ্ঞা সাপেক্ষ পর্যায়গুলোতে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। অপরদিকে, এতে করে আন্দোলন যদিও ধীর গতিতে চলে কিন্তু তার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত মজবুত ও সংহত হতে থাকে। কেবল এ ধরনের দাওয়াতী কার্যক্রম দ্বারাই সমাজের সর্বোত্তম মানুষগুলোকে টেনে এনে আন্দোলনে শরীক করা সম্ভব। এ পদ্ধতির প্রচারকার্যের ফলে অস্থির ও বখাটে লোকদের সমাবেশ ঘটানোর পরিবর্তে সমাজের সর্বাপেক্ষা সৎ লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং দৃঢ়, ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির কর্মী সংগৃহীত হয়। এ ধরনের লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও তাদের অংশগ্রহণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য উচ্ছৃংখল লোকদের সমাবেশের চেয়ে বেশী মূল্যবান ও উপকারী হয়ে থাকে।

আমাদের কর্মপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা নিজেদেরকে প্রচলিত বাতিল খোদাদ্রোহী আইন আদালতের সুবিধাগ্রহণ থেকে সেচ্ছায় বঞ্চিত করেছি। যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আমরা বাতিল তথা অনৈসলামিক মনে করি, আমাদের মানবাধিকার তথা জান, মাল ও মানসম্ভ্রম কোনো কিছুর নিরাপত্তার জন্য সেই বাতিল ব্যবস্থার সাহায্য আমরা নিতে চাইনা। তবে এ জিনিসটিকে আমরা বাধ্যতামূলক করিনি বরং আমাদের কর্মীদের সামনে একে একটি উচ্চতর মানদন্ড হিসেবে সংরক্ষণ করার পর তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছি যে, তারা ইচ্ছা করলে এই মানদন্ডের সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে উত্তীর্ণ হতে পারে, কিংবা পরিস্থিতির চাপের কাছে নতি স্বীকার ও পরাজয় বরণ করে যত নীচে পতিত

হতে চায় হতে পারে। তবে নীচে নামার একটা সীমা আমরা বেঁধে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি যে, এর চেয়ে নীচে যে নামবে আমাদের সংগঠনে তার কোনো স্থান নেই। ঐ ব্যক্তির স্থান জামায়াতে নেই যে মিথ্যা মামলাবাজী করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে এবং এমন মামলাবাজীতে জড়িয়ে পড়বে যা ন্যায়সংগত নয়, বরং নিছক স্বার্থ সন্ধানী ও আত্মাভিমানী মানসিকতা থেকে উদ্ভূত এবং বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থেকে উৎসারিত।

আমরা অনৈসলামী আইন আদালত থেকে সাহায্য গ্রহণ না করার যে নীতি অবলম্বন করেছি, লোকেরা আপাত দৃষ্টিতে তার উপকারিতা না বুঝে নানা রকমের প্রশ্ন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। এর প্রথম উপকারিতা হলো, এর দ্বারা আমরা এ কথা প্রমাণ করে থাকি যে, আমরা একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী সংগঠন। এ জিনিসটা আমরা এমন কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে থাকি যা কোনো বিনোদনমূলক কাজ নয়, বরং অত্যন্ত তিক্ত ও কঠিন পরীক্ষা সম্বলিত। যেহেতু আমরা দাবি করি, মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, আল্লাহর আইনের আনুগত্য না করে কেউ পৃথিবীতে আদেশ জারি করার অধিকারী নয় এবং আল্লাহর আইনের অনুমোদন ব্যতীত কেউ মানবীয় সমস্যার সমাধানে বিচার ফায়সালা করলে সে কাফির, ফাসিক ও যালিম, সেহেতু আমাদের এই দাবি ও এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ আমাদের জন্য এটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, আমরা যেনো নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য কোনো মানব রচিত আইনের আশ্রয় না নিই এবং যে শাসকের শাসন ব্যবস্থাকে বা যে সরকারকে আমরা অবৈধ মনে করি, তার কাছে যেনো ন্যায় ও অন্যায়ের বা হক ও বাতিলের ফায়সালা করার ক্ষমতা অর্পন না করি। আমাদের আকীদা বিশ্বাসের এই স্বাভাবিক দাবিকে যদি আমরা চরম ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের মুখেও পূর্ণ করে দেখিয়ে দিই তাহলে সেটা হবে আমাদের সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস ও কাজের সংগতির এমন অকাট্য প্রমাণ, যার চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন থাকেনা। পক্ষান্তরে কোনো লাভের আশা, ক্ষতির আশংকা বা যুলুম নির্যাতনের আঘাত যদি আমাদেরকে আমাদের আকীদা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করতে প্ররোচিত করে, তাহলে সেটা হবে আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যার পর আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন থাকেনা।

এ নীতির দ্বিতীয় উপকারিতা হলো, ব্যক্তির পরিপক্কতা এবং নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা নিরূপণের জন্য আমাদের কাছে এটি একটি কষ্টি পাথর হিসেবে কাজ করে। এ দ্বারা আমরা সহজেই জানতে পারবো আমাদের মধ্যে কে কতখানি পরিপক্ক এবং কে কি ধরনের পরীক্ষায় অবিচল থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এর তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, এ ধরনের লোকেরা এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের পর সমাজের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে আইন-কানুনের ভিত্তিতে নয় বরং নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। তার নৈতিক মান এতো উন্নত করতে হবে এবং নিজেকে নিজের পরিমন্ডলে এতোটা সৎ, ধার্মিক, খোদাভীরু এবং এমন আপাদমস্তক ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিমূর্তিতে পরিণত করতে হবে যেনো জনগণ আপনা থেকেই তার জীবন ও সহায় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য হ'য়ে যায়। কেননা এই নৈতিক রক্ষাকবচ ব্যতীত পৃথিবীতে তাদের জন্য আর কোনো রক্ষাকবচ অবশিষ্ট থাকেনা। একদিকে আইনগত রক্ষাকবচ থেকেও সে বঞ্চিত, অন্যদিকে তার নৈতিক রক্ষাকবচ অর্জনেও ব্যর্থ হওয়ার পরিণাম হবে, অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে একটি ছাগলের অবস্থান যেমনটি দাঁড়ায়।

এর চতুর্থ উপকারিতা এইয়ে, আমরা এভাবে নিজেদেরকে এবং নিজেদের স্বার্থ ও অধিকারকে বিপন্ন করে বর্তমান সমাজের নৈতিক অবস্থাকে বিশ্ববিবেকের সামনে নগ্ন করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো। আমরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিশ ও আইন আদালতের সাহায্য নিইনা এ কথা জেনেও যখন কিছু লোক আমাদের অধিকারের ওপর প্রকাশ্যে আক্রমণ ও লুটতরাজ চালাবে, তখন সেটা হবে আমাদের সমাজের নৈতিক দেউলেপনার সবচেয়ে স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ। এখানে অনেকে শুধু এ জন্য ভদ্র লোক সেজে রয়েছেযে, দেশের আইন তাদেরকে ভদ্র ও সৎ থাকতে বাধ্য করছে। এখানে এমন বহু লোক রয়েছে যারা কোনো শক্তি তাদের পাকড়াও করবেনা, এই নিশ্চয়তাটুকু পেলেই সব রকমের বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত। অনেকেই ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতার ভন্ডামিপূর্ণ আলখেল্লা পরে আছে, অথচ সুযোগ পেলেই এবং কোনো বাধাবন্ধন না থাকলেই তারা জঘন্যতম নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মবিরোধী ও হিংস কর্মকান্ড অনায়াসে করতে পারে। দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই নৈতিক ক্ষত ও অপরাধ প্রবণ মানসিকতা, যা ভেতরে ভেতরে আমাদের জাতীয় চরিত্রকে পঁচিয়ে গলিয়ে দিচ্ছে, একে আমরা সমগ্র দেশবাসীর সামনে উন্মুক্ত করে দেখাতে চাই, যাতে করে আমাদের সমগ্র জাতীয় বিবেক সচেতন হয়ে ওঠে এবং বুঝতে পারে, যে ব্যাধিটা সম্পর্কে এ যাবত তারা উদাসীন থেকেছে তা কতটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

আমার প্রিয় সাথীবৃন্দ! আমাদের দাওয়াত ও কর্মপন্থার এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আপনারা এটিকে যাচাই বাছাই করুন, কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচারবিবেচনা করুন যে, আমরা কিসের দিকে জনগণকে আহ্বান করছি? আহ্বান করার যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি তা

কতখানি সঠিক? তা আল্লাহ ও রসূলের শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ? বর্তমান সমাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাধিসমূহের কতটা নির্ভুল চিকিৎসা এ পন্থায় সম্ভব? এর দ্বারা আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী ও বাতিল বিধানসমূহকে পরাজিত করার লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফলতা লাভের আশা করতে পারি?

এবারে আমি আমার কোনো কোনো সাথীর মাধ্যমে পাওয়া কিছু সন্দেহ সংশয় ও আপত্তি সম্পর্কে দু'চার কথা নিবেদন করবো।

ওলামা ও পীর মাশায়েখগণের পক্ষ থেকে বাধা

যে আপত্তিটা একাধিকবার শুনেছি এবং আজও আমার কাছে লিখিতভাবে এসেছে, তা হলো, এতো সব বড় বড় আলেম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (যাদের জনা কয়েকের নামের তালিকাও দেয়া হয়েছে) কি ইসলাম সম্পর্কে এতোই অজ্ঞ ছিলেন যে, ইসলামের যেসকল দাবি ও চাহিদার কথা আপনি বর্ণনা করে থাকেন, তা তারা বোঝেননি এবং সেই দাবি পূরণের দিকে মনোযোগও দেননি? এমন কি আপনি বিষয়টা স্পষ্ট করে বর্ণনা করার পরও তারা তা মানেননি এবং আপনার সাথে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত হননি? এর দ্বারা কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, তারা সবাই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা আপনি স্বয়ং ইসলামের নামে এমন জিনিস পেশ করেছেন যা ইসলামের দাবি ও চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, আমি ইসলামকে অতীত কিংবা বর্তমান ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে নয়, বরং সবসময় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাই আল্লাহর দীন আমার কাছে এবং প্রত্যেক মুমিনের কাছে কি দাবি করে, তা জানার জন্য আমি অমুক অমুক মহান ব্যক্তি কি বলেন ও কি করেন তা দেখার চেষ্টা করিনা, বরং সে জন্য শুধু এটা জানার চেষ্টা করি যে, কুরআন কি বলে এবং রসূল সা. কি বলেছেন? জ্ঞানের এই উৎসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করার জন্যে আমি আপনাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা বিচার বিবেচনা করে দেখুন, যে জিনিসটির দিকে আমরা আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি, সেটি কুরআনের দাওয়াত কিনা এবং এই দাওয়াতের জন্য যে কর্মনীতি আমরা পেশ করে থাকি, সেটি নবীদের কর্মনীতি ছিলো কিনা? কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে, এই দাওয়াত যথার্থই কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত এবং এই কর্মনীতি নবীদেরই অনুসৃত কর্মনীতি, তাহলে আমাদের কথা মেনে নিন এবং আমাদের সাথে আসুন। আর যদি এই দাওয়াত ও কর্মনীতিতে কোনো জিনিস কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী থেকে থাকে, তাহলে নিসংকোচে তা প্রকাশ করে দিন। যে মুহূর্তে আমি ও আমার সাথীরা বুঝতে পারবো যে, আমরা কোনো ক্ষেত্রে এক

চুল পরিমাণও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছি, তখনই আপনারা দেখতে পাবেন, আমরা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিনা। কিন্তু আপনারা যদি হক ও বাতিলের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে চান তাহলে সেটা আপনাদের মর্জি। এ ব্যাপারে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন যে, আপনারা নিজেদেরকে ও নিজেদের ভবিষ্যতকে কতিপয় ব্যক্তির হাতেই সোপর্দ করে দেবেন কিনা এবং আল্লাহর কাছে এই জবাবদিহী করবেন কিনা যে, আমরা তোমার দীনকে তোমার কিতাব ও তোমার রসূলের সুন্নাহর পরিবর্তে অমুক অমুক ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম? এরূপ জবাবদিহী যদি আপনাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে নিশ্চিন্তে এভাবেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন।

বৈরাগ্যবাদের অভিযোগ

আরো একটি অভিযোগ এসেছে। একজন অত্যন্ত আন্তরিকতা সম্পন্ন সমর্থক এ অভিযোগটি পেশ করেছেন বলে আমাকে বলা হয়েছে। সেটি হলো, "আপনাদের এই কর্মপদ্ধতি এমন কিছু সংখ্যক সংসারত্যাগী ও বৈরাগ্যবাদী লোকের জন্য উপযোগী, যারা দুনিয়ার সকল কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছে এবং প্রচলিত রাজনীতির সাথে যারা কোনোই সম্পর্ক রাখেনা। অথচ বর্তমান পরিস্থিতি এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সেসব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে মুসলমানদের ব্যাপৃত হতে বাধ্য করছে, যার সমাধানের ওপর গোটা জাতির ভাগ্য নির্ভরশীল। শুধু মুসলমানই নয়, বরং অমুসলিমরাও সবকিছুর আগে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা এর ওপরই তাদের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। সুতরাং এ দেশে যারা জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সে ব্যাপারে সচেতন, তারা আপনাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করতে পারেনা। তবে কিছু ধর্মপ্রাণ গোছের সংসারত্যাগী লোক আপনারা অবশ্যই পেয়ে যেতে পারেন।"

এ আপত্তিটা মূলত এক ধরনের স্থুল দৃষ্টির ফলশ্রুতি। আমাদের এ যুগের রাজনীতিকগণ সাধারণত এরকম ভাসাভাসা দৃষ্টি দিয়েই বিভিন্ন সমস্যা দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত। তারা রাজনীতির কেবল বাহ্যিক কাঠামোগত পরিবর্তনকেই পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাতেই নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধান খোঁজেন। কিন্তু যে ভিত্তির ওপর রাজনীতির ইমারত নির্মিত হওয়া দরকার, তার দিকে তাদের দৃষ্টি যায়না। বর্তমানে যেসব রাজনৈতিক সমস্যার চিন্তায় আমরা গলদঘর্ম হচ্ছি, সেগুলো কি কারণে সৃষ্টি হয়েছে ভেবে দেখুন তো! তা কি শুধু এই কারণে নয়

যে, এদেশের সমাজ ব্যবস্থা যেসব মূলনীতি, আকীদা, চিন্তা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেগুলো এতোই দুর্বল ছিলো যে, একটি ভিনদেশী জাতি কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে এসে আমাদেরকে তাদের অধীন করে নিতে সক্ষম হয়েছে? বহিরাগত এই জাতিটি চরম পথভ্রষ্ট ও দুষ্কর্ম প্রবণ থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কতকগুলো নৈতিক গুণ, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিক শক্তি এবং মানবীয় যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো, যার বলে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী প্রমাণিত হয়। আর এই অগ্রগামিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই তারা আমাদেরকে গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। উপরন্তু যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত ত্রুটি বিচ্যুতি ও উদাসীনতার কারণে মুসলমানদের এমন শোচণীয় অধপতন হয়েছে যে, এই গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকাকালেই আমাদের দেশী অন্যান্য জাতি আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো। ফলে আমাদের জন্য এই প্রশ্নের উদ্ভব হলো যে, প্রথমে কাদের আধিপত্য থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করি? দেশীয় শত্রুদের কবল থেকে, না কি বিদেশী শত্রুদের কবল থেকে? এই হলো আমাদের বর্তমান যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সংক্ষিপ্ত সার। এই সমস্ত সমস্যাকে আপনারাও এবং আপনাদের দেশী অন্যান্য জাতিগুলোও কেবল একটি উপায়ে সমাধান করতে চায়। আর সেই উপায়টি হলো, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনিই থাক, শুধু তাতে কিছু বাহ্যিক রদবদল সংঘটিত হোক। আমি এই রাজনীতিকে এবং এই রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিকে একেবারেই অর্থহীন মনে করি। এতে নিজের সময় নষ্ট করার কোনই স্বার্থকতা আমি খুঁজে পাইনা। আর শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, বরং সারা বিশ্বে বর্তমানে যেসব রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজিত, তার সংক্ষিপ্ত সারও আমার মতে শুধু এই যে, পৃথিবীতে যে মর্যাদা ও অবস্থান বাস্তবিক পক্ষে মানুষের ছিলো না, মানুষ অনর্থক সেই অবস্থান ও মর্যাদায় সমাসীন হবার জন্য জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ভিত্তি খোদাদ্রোহিতা ও খোদাবিমুখতার ওপর স্থাপন করেছে। এর পরিণতি এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয় ও অরাজকতার আকারে এবং পাপ ও দুষ্কর্মের এক ভয়াবহ তান্ডবের আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে নিছক বাহ্যিক ছক ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে এই অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে ঠেকানোর যে তোড়জোড় ও চেষ্টা তদবির বর্তমানে চলছে, তারই নাম আজ "রাজনীতি।" এ রাজনীতি শুধু আমার মতে নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতেও একেবারেই অর্থহীন, নিষ্ফল। আমি ইসলামী আদর্শের যে শিক্ষা অর্জন করেছি তার আলোকে আমার মতে এ দেশের সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের জনগণের এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীর যাবতীয় রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, আমাদের সকলকে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য অবলম্বন

করতে হবে, তাঁর আইনকে নিজেদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা ফাসিক, পাপাচারী ও অসৎ লোকদের পরিবর্তে আল্লাহর অনুগত সৎ লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। এই রাজনীতি যদি আপনাদের আকৃষ্ট না করে এবং আপনারা অন্য কোনো ধরনের রাজনীতি দ্বারা নিজেদের সমস্যাবলী সমাধান করতে চান তাহলে আপনাদের পথ ভিন্ন এবং আমার পথ ভিন্ন। আপনারা যে যে পন্থায় নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চান, করুন। কিন্তু আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ আপন প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে জিনিসের মধ্যে নিজেদের, নিজেদের দেশ ও জাতির এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ দেখতে পাই, তাতেই আমাদের সকল চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করতে থাকবো। দুনিয়ার মানুষ যদি আমাদের কথায় কর্ণপাত করে, তবে তাতে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি কর্ণপাত না করে তবে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করবে। আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

এরপর আর একটি অভিযোগ নিরসন করা বাকী রইলো। সেটা হলো, আমরা নাকি বৈরাগী ও সংসারত্যাগীদের একটা দল বানাচ্ছি। এটা সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি না হলেও বাস্তবিক পক্ষে একটি ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা স্পষ্ট ভাষায় এ ভুল বুঝাবুঝি দূর করে দিতে চাই। আমরা আসলে এমন একটি দল গঠন করতে চাই, যার সদস্যরা একদিকে খোদাভীরুতায় ও পরহেজগারীতে প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে মুত্তাকী ও পরহেজগারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে। অপরদিকে দুনিয়ার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ দুনিয়াদারদের চেয়ে অধিকতর ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমাদের মতে দুনিয়ার যাবতীয় অনাচারের একটা প্রধান কারণ হলো, সৎ লোকেরা সততার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে সংসারত্যাগী হ'য়ে ঘরের কোণে বসে যায় এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ড এড়িয়ে চলাকেই পরহেজগারী মনে করে। অপরদিকে সারা দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ডের ওপর অসৎ লোকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই অসৎ লোকেরা মুখে কখনো সৎ কাজের কথা উচ্চারণ করলেও তা একমাত্র জনগণকে প্রতারিত করার জন্যই করে থাকে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির প্রতিকার কেবল এভাবেই করা সম্ভব যে, এমন সৎ লোকদের দ্বারা একটি দল গঠন করতে হবে, যারা খোদাভীরু, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহর পছন্দনীয় চরিত্র ও সৎগুণাবলীতে সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ডকে দুনিয়াদারদের চেয়েও ভালোভাবে বুঝবে এবং জাগতিক কর্মকান্ডে এতটা দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে যে, তা দ্বারা সমস্ত অসৎ দুনিয়াদারদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। আমার মতে এর চেয়ে বড় কোনো রাজনৈতিক কাজ

আর হতে পারেনা। আর এ ধরনের একটি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ জনগোষ্ঠী তৈরী করার চেয়ে সফল রাজনৈতিক আন্দোলনও আর কিছু হতে পারেনা। এ ধরনের একটি মানব গোষ্ঠী যতক্ষণ তৈরী না হয়, কেবল ততক্ষণই অসৎ চরিত্র ও আদর্শহীন লোকদের জন্য দুনিয়ায় বিচরণ ও লুটতরাজ চালানোর সুযোগ থাকে। আর যখন এ ধরনের লোকদের একটি দল তৈরী হয়ে যাবে, তখন নিশ্চিত জেনে রাখুন যে, শুধু এ দেশেরই নয়, বরং পর্যায়ক্রমে সারা দুনিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ও ন্যায়বিচারের বাগডোর এই দলটির হাতে এসে যাবে এবং তাদের উপস্থিতিতে পাপাচারী ও চরিত্রহীন লোকদের আধিপত্য দুনিয়ায় চলতে সক্ষম হবেনা। আমি বলতে পারিনা এই বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হবে। তবে আমি আগামী কালের সূর্যোদয়ে যতটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি, ঠিক ততটাই অকাট্যভাবে বিশ্বাস করি যে, এ বিপ্লব অবশ্যই সংঘটিত হবে। শর্ত শুধু এইযে, সৎ লোকদের এমন একটি দল গঠনে আমরা যেনো সফল হই।

সাথী ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ

এবার আমি আমার সাথী ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

সম্মানিত সাথী ও সহকর্মীবৃন্দ!

আমি সবসময় এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যে কথাটা বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকি, সর্বপ্রথমে সেই কথাটার পুনরাবৃত্তি করা আবারো জরুরী মনে করছি। সে কথাটা হলো, আপনারা আল্লাহর সাথে অংগীকারে আবদ্ধ হ'য়ে যে দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছেন, সেই বিরাট দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। আপনাদের এই অংগীকারের দাবি শুধু এটা নয় যে, আপনারা আল্লাহর আইনের অধিকতর অনুগত হবেন, আপনাদের বিশ্বাস, কথা ও কাজে পূর্ণ সংগতি ও মিল থাকবে এবং আপনাদের জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগ এমন থেকে যাবেনা, যেখানে ইসলামের সাথে আপনার চিন্তা ও কর্মের কোনো বিরোধ ও বৈষম্য থাকবে। বরং সেই সাথে আপনার অংগীকারের অত্যন্ত প্রবল ও জোরদার দাবি এটাও যে, আপনি যে ইসলামের প্রতি ঈমান এনেছেন, যে ইসলামকে আপনি নিজের রাজার ধর্ম মনে করেন এবং যে ইসলামকে আপনি সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা এবং একমাত্র মুক্তির পথ মনে করেন, তাকে অন্য সমস্ত ধর্ম, মতবাদ, ও বিধানের ওপর বিজয়ী করার জন্য এবং মানব জাতিকে সকল বাতিল ধর্ম ও মতের বিপর্যয়কর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে সত্য দীনের সুফল ও সুখ সমৃদ্ধির অংশীদার করার

৩—

জন্য আপনার মধ্যে অন্তত এতটা অস্থিরতা সৃষ্টি করুন, যতটা অস্থিরতা বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের অনুসারীরা নিজেদের মিথ্যা ও ধ্বংসাত্মক মতাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ, সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য দেখিয়ে থাকে। বাতিল মতবাদের অনুসারী একটি মানবগোষ্ঠী কঠিন থেকে কঠিন বিপদের ঝুঁকি, বড় বড় ক্ষয়ক্ষতি, জীবন ও সহায় সম্পদের বিনাশ প্রাপ্তি, দেশ ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার আশংকা এবং নিজেদের, সন্তান সন্ততির ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনের জীবন নাশ এবং ত্যাগ ও কুরবানী শুধু এজন্য সইয়ে যাচ্ছে যে, তারা যে জীবন পদ্ধতিক সঠিক মনে করে এবং যে মতাদর্শে তারা নিজেদের মুক্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পায়, তাকে শুধু নিজ দেশে নয়, বরং সারা দুনিয়ায় বিজয়ী করতে বদ্ধপরিকর। এদের দৃষ্টান্ত আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের ধৈর্য, তাদের ত্যাগ, কুরবানী ও শ্রম, তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের আসক্তিকে আপনারা নিজেদের কর্মকান্ডের সাথে তুলনা করে দেখুন এবং উপলব্ধি করুন যে, এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে আপনাদের মিল বা গরমিল কতখানি। যদি বাস্তবিক পক্ষে আপনারা কখনো তাদের মোকাবিলায় বিজয়ী হতে চান, তবে এইসব দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অগ্রগামী হলেই কেবল হতে পারবেন। নচেত আপনাদের আর্থিক কুরবানী, আপনাদের সময় ও শ্রমের কুরবানী এবং নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা ও তার জন্য আপনাদের ত্যাগ স্বীকারের যে অবস্থা এখন বিদ্যমান, তা দেখলে তো ইসলামের বিজয়ের আশা হৃদয়ে পোষণ করার অধিকারও আপনাদের থাকেনা।

দ্বিতীয় যে জিনিসটির দিকে আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার প্রয়োজন বারবার অনুভব করি, তা হলো, আপনারা দীন ইসলামের মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। ছোট খাট ও খুঁটিনাটি জিনিসগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়ার ব্যাধি গোটা ধর্মীয় পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করুন। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের লোকদের মধ্যে এখনো সেইসব খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি বেশ খানিকটা আসক্তি, বরং সত্যি বলতে কি অনেকখানি বাড়াবাড়ির প্রবণতা রয়েছে, যেসব বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবত ফের্কাবন্দী, দলাদলি ও দ্বন্দ্ব-কলহ চলে এসেছে। এই কলহ-কোন্দল ও রেষারেষী সময় সময় এতোটা তীব্র আকার ধারণ করে যে, তা নিরসনের জন্য আমরা যখন বুঝাই, তখন সেটা পরিত্যাগ করার পরিবর্তে আমাদের কোনো কোনো বন্ধু উল্টো আমাদেরকে এতে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এ কথা ভালো করে বুঝে নিন, যে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আপনারা বিবাদ বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন, সেগুলো আপনাদের কাছে যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই

সেগুলো ঐসব জিনিসের আওতাভুক্ত নয়, যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহপাক নবী পাঠিয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য এসব খুঁটিনাটি বিষয় কায়েম করা নয়, বরং আল্লাহর দীন কায়েম করা। নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের আসল উদ্দেশ্য ছিলো, মানুষ যেনো তাদের আসল মনিব ও মালিক ছাড়া আর কারো আজ্ঞাবহ না থাকে, একমাত্র আল্লাহর আইন যেনো দেশের আইন হিসেবে চালু থাকে, শুধু আল্লাহকেই যেনো সবাই ভয় করে, আদেশ নিষেধ যেনো শুধু আল্লাহরই মানা হয়, হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণে এবং জীবনের সরল ও সঠিক পথের সন্ধানে কেবল সেই নির্দেশনাই যেনো মানা হয়, যা আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। পৃথিবী থেকে সেসব অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন যেনো করা হয়, যা আল্লাহর কাছে ধিকৃত ও ঘৃণিত এবং যে সৎ কাজ ও কল্যাণমূলক কাজ আল্লাহর নিকট প্রিয়, তা যেনো কায়েম করা হয়। এই হলো ইসলাম। এরই প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য এবং মুসলিম হিসেবে আমরা এ কাজের জন্যই আদিষ্ট। এ কাজের গুরুত্ব যদি আপনারা পুরোপুরিভাবে অনুভব করেন এবং এ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পৃথিবীতে বাতিল ব্যবস্থা বিজয়ী হওয়ায় দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি কি সাংঘাতিকভাবে আল্লাহর গযবে নিপতিত হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তা যদি উপলব্ধি করেন এবং এ পরিস্থিতিতে আমদের জান, মাল, জিহ্বা ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি শুধু আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টায় নিয়োজিত করা-ই যে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার একমাত্র উপায় তাও যদি অনুধাবন করেন, তাহলে আপনাদের পক্ষে কখনো সেইসব বাজে অর্থহীন তর্ক বহছ ও নিরর্থক চিন্তায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবেনা, যাতে এ যাবত আপনাদের অনেকেই লিপ্ত থেকেছেন। আমার মনে হয়, ইসলামের আসল পরিচয় কি এবং তার অনুসারীদের কাছে তার প্রকৃত দাবি কি কি, সেটা বুঝতে না পারার কারণেই এ ধরনের কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকা সম্ভব হয়েছে।

আরো একটি ত্রুটি কারো কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং সেটি প্রায়ই আমাদের বিব্রত করে থাকে। সেটি হলো, এ সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য ও তত্ত্বগত দিক দিয়ে তো আমাদের মতাদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু আমাদের কর্মপদ্ধতি ভালো করে বোঝেননি। এ জন্য বারংবার তাদের দৃষ্টি চলে যায় অন্যান্য কর্মপদ্ধতির দিকে এবং কোনো না কোনোভাবে তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক রেখে অন্যান্যদের কর্মপদ্ধতিকে তার সাথে মিশ্রিত করে একটা জগাখিচুড়ি তৈরী করার চেষ্টা চালান। আর যখন তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা ভাবেন, আমরা খামাখাই একটা দ্রুত ফলদায়ক ও কার্যকর কর্মপদ্ধতিকে নিছক এই ওজুহাতে গ্রহণ করছিনা যে, ওটা আমাদের নয়

বরং অন্যদের উদ্ভাবিত কর্মপদ্ধতি। কেউ কেউ তো এতদূর বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন যে, আমরা বাধা দান করা মাত্রই আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন যে, আপনাদের নামই উল্লেখ করা হবে, অন্য কারো নয়। তাদের ধারণাটাএইযে, জামায়াতের সকল চেষ্টা সাধনা যেনো কেবল নিজেদের রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক চালানোর উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। মজার ব্যাপার হলো, তারা এরূপ মনে করার পরও আমাদের সাথে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন। .... কোথাও কোথাও লোকেরা এই ব্যাধি দ্বারা বিশেষভাবে অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যেখানে লোকেরা তেমন প্রভাবিত হয়নি, সেখানেও নানাভাবে এই মনোভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, কোনো দ্রুতগতিশীল কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে রাতারাতি একটা কিছু করে দুনিয়াবাসীর সামনে উপস্থাপন করা হোক। এসব কিছু হচ্ছে মুসলমানদের দীর্ঘদিন ধরে লালিত "পরিকল্পনা বিহীন কাজ করা"র ব্যাধির ফল। এই ব্যাধি "কর্মবিহীন পরিকল্পনার" ব্যাধির চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। আমি আপনাদেরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত এসব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো একটিতেও যদি বাস্তবিকপক্ষে কোনো প্রাণ থাকতো, তাহলে আমরা হয়তো এই আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে আরো কিছু চিন্তাভাবনা করতাম এবং ঐসব ফর্মুলার পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতাম। কিন্তু যে সামান্য প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহপাক আমাদের দিয়েছেন, তার আলোকে আমরা খুব ভালোভাবে এটা বুঝে নিয়েছি যে, যেসব দল ও নেতৃত্ব দেশে বর্তমান রয়েছে, তার কোনোটাতেই না আছে মুসলমানদের রোগের সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, আর না আছে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য পূরণের নিশ্চয়তা। এ সকল আন্দোলন ও সংগঠন মুসলমানদের রোগ নির্ণয়ের যে কাজটুকু করেছে, তা একেতো আংশিক, উপরন্তু একেবারেই স্থূল, ভাসাভাসা ও অপর্যাপ্ত। তারা ইসলামের মূল দাবি ও চাহিদা কি কি তাও সঠিকভাবে অনুধাবন করেনি। তাছাড়া বর্তমানে কুফরী ও পাপাচারের যে প্রতাপ ও আধিপত্য এবং ইসলামের যে অসহায় অবস্থা বিরাজমান, তার কারণ কি কি এবং এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন্ কোন্ ময়দানে কিরূপ ধারাবাহিকতা সহকারে কি কি কাজ করা দরকার, তাও তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি। এসব জিনিস না বুঝে ও এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা না করে যে স্থূল ও আংশিক আন্দোলন শুরু করা হয়েছে এবং তা পরিচালনার জন্য যে দ্রুত গতিশীল ও তাৎক্ষণিক ফল প্রদর্শনকারী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সেসব যদিও আমাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত, অবৈধ বা অশুদ্ধ নয়, যদিও আমরা তার নিন্দা করি না এবং এসব আন্দোলনের পেছনে যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সক্রিয় ছিলো,

যদিও তার কদর করি, তথাপি আমরা এগুলোকে নিষ্ফল ও বৃথা অবশ্যই মনে করি। আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এ ধরনের আন্দোলন যদি শত শত বছর ধরেও পূর্ণ সাফল্য ও ঝাঁকজমকের সাথে চলতে থাকে তবুও চলমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো যথার্থ পরিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত হতে পারবেনা। সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব যদি কোনো আন্দোলন দ্বারা সংঘটিত হতে পারে, তবে তা আমাদের এই আন্দোলন দ্বারাই হতে পারে। এর জন্য আমরা যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছি, সেটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। ইসলামের মেযাজ, স্বভাবপ্রকৃতি ও ইতিহাসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমরা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এ কথা সত্য যে, আমাদের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত ধৈর্য সাপেক্ষ এবং বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন নয়। এ দ্বারা দ্রুত কোনো দর্শনীয় সুফল অর্জন করাও সম্ভব নয়। এ কাজে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত পরিশ্রম করতে হয়। এর ফলাফল ও বাস্তব অগ্রগতি অনেক সময় এরজন্য শ্রমদানকারীও নিজেও টের পায়না। অথচ এই পথে এটাই সাফল্যের একমাত্র উপায় এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের আর কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তবে যারা আমাদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি বা এর কোনো একটিতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত নয় তাদের জন্য এ সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের স্বাধীন বিচার বিবেচনা অনুসারে কাজ করার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে এ অধিকার কিছুতেই দেয়া যেতে পারেনা যে, তারা জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থেকে আপন উদ্যোগে এই দুটি বিষয়ে বা এর কোনো একটিতে যেমন খুশী তেমন সংশোধন ও রদবদল করে নেবে। আমাদের সাথে যে চলতে চাইবে তাকে পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও নিশ্চিন্ততা সহকারে আমাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিকে সঠিক বলে মেনে নিয়ে চলতে হবে। আর যার অন্যান্য দল ও আন্দোলনে প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ রয়েছে, তার প্রথমে ঐসব দল ও আন্দোলনকে পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখা উচিত। এরপর যদি তার মন সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়, যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি, তাহলে সে যেনো নিশ্চিন্ত মনে ও সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের সাথে আসে।

বাহ্যদর্শিতা, প্রদর্শনেচ্ছা ও দ্রুততাপ্রীতির যে মানসিকতা মুসলমানাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তার একটা সাক্ষাত প্রমাণ আমি সম্প্রতি পেয়েছি। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রসারের যে কর্মসূচী আমরা কিছুদিন আগে দিয়েছিলাম, তার প্রতি তো খুব কম লোকই আকৃষ্ট হলো। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী অভিযান পরিচালনা ও তাৎক্ষণিক ফল লাভের (চাই সে ফল যতোই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন) কর্মসূচীটির জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের বন্ধুদের চাহিদা ও দাবি অব্যাহত রয়েছে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়েও এ কাজ থেকে কাউকে নিবৃত্ত করা

যাচ্ছেনা। অথচ বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীটি দীর্ঘ মেয়াদী হলেও খুবই ফলপ্রদ। এই কর্মসূচীতে এক বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় ধরে নিরক্ষর জনগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ক্রমাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পাকাপোক্ত করে নেয়া হয়। তাদের আকীদা বিশ্বাস, আমল আখলাক, স্বভাব চরিত্র, জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ, সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। তারপর তাদের স্থায়ী কর্মীতে পরিণত করে কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দেয়া যায়। পক্ষান্তরে গ্রুপ দাওয়াতের কর্মসূচীর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে একসাথে কতিপয় প্রাথমিক ধর্মীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্যে একটা উদ্দীপনার সঞ্চার করে ছেড়ে দেয়া হয়। এদের কাছে দ্বিতীয়বার দাওয়াতী অভিযানে বেরুলে প্রথমবারের দাওয়াতের কোনো প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন। যখন আমি দেখি, লোকেরা এই দুই কর্মপদ্ধতির মধ্যে যেটি দীর্ঘমেয়াদী, আয়াসসাধ্য ও ধৈর্যসাপেক্ষ সেটি শুনেও তার প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়না, অথচ দ্বিতীয়টির দিকে বার বার ব্যাকুলভাবে ছুটে যেতে চেষ্টা করে, তখন আমার কাছে মুসলমানদের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে। এই ত্রুটিগুলোর কারণেই তারা এ যাবত নিজেদের শক্তি, শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় করে এসেছে। এ প্রসংগে আমি কেবল এতোটুকুই বলতে পারি যে, এই আন্দোলনের পরিচালনার ভার যতোক্ষণ আমার হাতে ন্যস্ত থাকবে, ততোক্ষণ আমি আমার সাথীদের সঠিক ও যথার্থ ফলপ্রসূ কাজেই লাগাতে চেষ্টা করবো এবং জেনে শুনে তাদের নিষ্ফল কাজে নিয়োজিত হতে দেবোনা।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে সর্বশেষ একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী মনে করছি। আমাদের বন্ধু-সাথীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রচার ও সংস্কারধর্মী কাজে কঠোরতা ও বলপ্রয়োগের মনোভাব পোষণ করে থাকেন। তাদের কাছ থেকে আমার কাছে যেসব প্রশ্ন অহরহ এসে থাকে, তা থেকে আমার মনে হয়, বিপথগামী লোকদের সংশোধনের জন্য তাদের মধ্যে এতোটা ব্যাকুলতা নেই, যতোটা ব্যাকুলতা রয়েছে তাদেরকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও বহিষ্কার করার জন্য। ধর্মীয় আবেগ তাদের মধ্যে যতোটা বিদ্বেষ ও ক্রোধের মনোভাব উস্কে দিয়েছে, হিতকামনা ও সহানুভূতির মনোভাব ততোটা জাগায়নি। এ কারণে তারা অধিকাংশ সময় জিজ্ঞাসা করে থাকে, অমুক অমুক স্বভাবের লোকদের সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করবো কিনা? তাদের সাথে নামায পড়া চলবে কিনা? তাদেরকে কাফের ও মোশরেক বলে অভিহিত করলে ক্ষতি কি? অথচ এরূপ প্রশ্ন করার ইচ্ছা তাদের

খুব কমই হয় যে, আমরা আমাদের এই বিপথগামী ভাইদের কিভাবে সোজা পথে আনতে পারি? তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে কিভাবে দূর করা যায়? তাদের বক্রতাকে কিভাবে সোজা করা যায়? তাদেরকে হিদায়াতের আলো দ্বারা আলোকিত করার উপায় কি? আমি বিনীত আনুরোধ করছি, যারা আল্লাহর অনুগ্রহে ও সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের সরল ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে যেনো কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার মনোভাব জেগে না উঠে। তবে আমি এসব কথা খোলাখুলিভাবে বলছি এ জন্য যে, আমাদের সহকর্মীগণ যেনো পূর্ণ খোদাভীতি সহকারে মনটাকে যাচাই করে দেখেন, সেখানে শয়তান এই রোগটি ঢুকিয়ে দিলো কিনা?

প্রকৃত ব্যাপার হলো একটি বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত সমাজে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বনকারী ও সৎ কর্মশীল কিছু লোকের অবস্থানকে একটি মহামারী উপদ্রুত জনপদে এমন কয়েকজন সুস্থ ও নীরোগ ব্যক্তির অবস্থানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যারা কিছুটা চিকিৎসা বিদ্যায়ও পারদর্শী এবং কিছু ওষুধপত্রেরও অধিকারী। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো সেই মহামারী উপদ্রুত জনপদে এই সুস্থ ক'জন চিকিৎসকের প্রকৃত করণীয় কি? তারা কি ঐ রোগীদের প্রতি এবং তাদের রোগ জর্জরিত অবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করবে? তাদেরকে দূর দূর করে তাড়াবে? তাদেরকে রেখে পালাবার চেষ্টা করবে? না কি নিজেদেরকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে হলেও তাদের সেবা ও চিকিৎসার কথা চিন্তা করবে? আর একাজ করতে গিয়ে তাদের দেহে ও পোশাকে যদি কিছু ময়লা লেগেও যায়, তবে তা বরদাশত করবে? আমি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তারা যদি রোগীদের ঘৃণা করে এবং তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তবে আল্লাহর কাছে মস্তবড় অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাদের সুস্থতা, তাদের চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া ও তাদের কাছে ওষুধ থাকায় তাদের কোনো লাভ তো হবেই না, বরং তাতে তাদের অপরাধের প্রচন্ডতা ও বীভৎসতা আরো বেড়ে যাবে। এই বক্তব্যের আলোকেই আপনি বিবেচনা করুন, যারা ইসলামী সুস্থতার অধিকারী, যারা ইসলামী জ্ঞান রাখেন এবং সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কেও অবহিত, তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ কোন্‌টি?

ইসলামী দাওয়াত ঃ সাফল্যের মূলনীতি

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

[এ অংশটি মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর দুটি ভাষণের সংকলন। শিয়ালকোট ও এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত (১৯৪৬) জামায়াতের দুটি সম্মেলনে তিনি এ দুটি ভাষণ প্রদান করেন। –সম্পাদক]

সম্মানিত উপস্থিতি!

একটানা পরিশ্রম ও কর্মব্যস্ততার কারণে আমি এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, এ সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু সুযোগ পেয়েও আমি কিছু জরুরী কথা যদি আপনাদের কানে না পৌঁছাই, তাহলে সেটা হবে এই সুযোগের অমর্যাদা করার শামিল। যে কথা কটি বলবো, তা বলার পয়লা উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানানো, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো আপনারা এ কথাগুলোর সাথে একমত হলে অন্যদের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য আপনাদের অনুরোধ করা। আমি এখন ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো এবং এই আন্দোলনের ভিত্তি কি কি তা ব্যাখ্যা করবো। এই আন্দোলনের সাথে আমার জড়িত হওয়ার মূল কারণ হলো, এ আন্দোলন এমন কতকগুলো সর্বস্বীকৃত মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনোই দ্বিমত নেই। এই সর্বসম্মত মূলনীতিগুলোতে আমি পূর্ণ জ্ঞানগত অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিশ্বাস রাখি এবং আমরা সবাই এগুলোর ব্যাপারে একমত।

আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, ইসলামের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটা আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ রসূলের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা থেকেই উদ্ভুত ও উৎসারিত। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য এবং রসূল সা. এর দাওয়াত গ্রহণ ও অনুসরণের কারণেই আমরা নিজেদের মুসলিম বা মুসলমান বলে থাকি। এ জিনিসগুলোর প্রতি আমাদের আনুগত্য দুর্বল হয়ে গেলে ইসলামের সাথে আমাদের সম্পর্কও দুর্বল হয়ে যাবে, আর এ আনুগত্য বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হলে ইসলামের সাথে সম্পর্ক বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার পর দুনিয়ার আর যে জিনিসের সাথেই সম্পর্ক স্থাপিত হোক না কেন, ইসলামের সাথে আর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনা।

আজকাল জাতি ও সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে যে উপাদানের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে স্বদেশিকতা ও স্বজাতীয়তা বোধ তথা ভূখন্ড, প্রজাতি, রক্ত ও বর্ণের ঐক্য। সভ্যতা ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে যারা চিন্তাগবেষণা করেন, তারা জানেন যে, জাতি ও সভ্যতা এসব মৌল উপাদান দিয়েই গঠিত হয়ে থাকে। একজন বৃটিশের বৃটিশ জাতীয়তা, একজন জার্মানের জার্মান জাতীয়তা এবং একজন জাপানীর জাপানী জাতীয়তা তার বর্ণ, বংশ ও দেশের ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু একজন মুসলমান, তা সে যতো নির্বোধই হোক না কেন, (যদিও প্রকৃত সত্য এইযে, মুসলমান কখনো নির্বোধ হয়না) কখনো এই ভ্রান্ত ধারণয় লিপ্ত হতে পারেনা যে, এসব উপাদান দ্বারা ইসলামী জাতীয়তা গঠিত হতে পারে। সে খুব ভালো করেই জানে যে, আল্লাহ ও রসূলের সাথে তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তারই ভিত্তিতে ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আল্লাহ ও রসূলের সাথে তার এই সম্পর্কই একজন মুসলমানের সাথে আর একজন মুসলমানের বন্ধন গড়ে তোলে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক থাকেনা। আর ইসলাম থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ইসলামের সমাজ কাঠামোতে তার কোনো স্থান থাকেনা। আপনাদের এই সড়কে চলাচলকারী একজন সাধারণ মুচি, যার চৌদ্দ পুরুষের ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিলোনা, সে যদি এই মুহূর্তে রসূল সা. এর শেখানো ইসলামের মৌল শিক্ষা ও আকাদীগুলোকে মেনে নেয়, তবে সে তৎক্ষণাত্ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ও মুসলিম সমাজের সদস্য হয়ে যাবে এবং আপনাদের মসজিদের প্রথম কাতারে স্থান লাভের যোগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বহু প্রজন্ম ধরে মুসলমান, এমনকি পীর মোরশেদ হিসেবে খ্যাত, তার কোনো হতভাগা সন্তান যদি ইসলামের মৌল আকীদাসমূহের কোনো একটিকেও অস্বীকার করে, তবে কেউ তাকে আমাদের মসজিদের শেষ কাতারেও দাঁড়ানোর সুযোগ দিতে পারেনা, চাই তার বংশ নবীর বংশেরই কোনো শাখা হোক না কেন। সুতরাং ইসলামী আদর্শের চোখে বর্ণ, বংশ ও ভৌগলিক বাসস্থান একেবারেই অর্থহীন।

ইসলামের মৌল আকীদা সমূহ ও তার মর্মার্থ

এবার আসুন ভেবে দেখা যাক, যে ইসলামের বন্ধন আমাদের সমাজ, সভ্যতা সব কিছুরই নিয়ামক, তার সেই মৌল আকীদা সমূহ কি কি, যার ওপর সারা দুনিয়ার মুসলমানরা একমত এবং যেগুলোকে নিষ্ঠার সাথে মেনে না নিলে কোনো ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনা, আর সেগুলোর ওপর তার আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্য বহাল না থাকলে সে মুসলমান থাকতে পারেনা?

আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, পয়লা জিনিসটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ শুধু মুখ দিয়ে "আ-মানতু বিল্লাহ- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম" এই কথাটা উচ্চারণ করা নয়। এতোটুকু কথা তো আবু জাহেল এবং আবু লাহাবও স্বীকার করতো। শুধু এই স্বীকৃতিটুকু দিয়েই আমরা আবু লাহাব ও আবু জাহেলের চেয়ে ভালো মানুষ হয়ে গিয়েছি- এ কথা বলতে পারিনা। বরঞ্চ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এ কথাটা স্বীকার করে। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কলংক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পৃথিবী চিরকালই আল্লাহকে মেনে এসেছে। এটা কেবল বর্তমান সভ্য যুগেরই বৈশিষ্ট্য যে, তা এমনসব বিবেকহীন মানুষের জন্ম দিচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করেনা। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কেবল আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়া হতে পারেনা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রকৃত তাৎপর্য ও মর্মার্থ হলো, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই মহোত্তম গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনতে হবে, যা বিশ্ববিধাতা ও বিশ্বপ্রভুর উপযোগী এবং যার শিক্ষা স্বয়ং নবীগণ দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ শুধু আছেন একথা মানা যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে এও মানতে ও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি আমাদের স্রষ্টা, মালিক, মনিব ও সার্বভৌম প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা তথা দাস ও গোলাম। আমাদের ইচ্ছা ও মর্জি তাঁর হুকুম বা আদেশের সামনে কিছুই নয়। তিনি আইনদাতা, শরীয়ত প্রণেতা, ক্ষতি ও উপকারের মালিক, নিরংকুশ ও সর্বাত্মক ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি ছাড়া এসব গুণের অধিকারী আর কেউ নয়। তাঁর গুণাবলীর কোনো একটিতেও যদি অন্য কারো অংশীদারী মেনে নেয়া হয় বা আল্লাহর ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার করা হয়, তাহলে গোটা ঈমানই যে বরবাদ হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমরা এমন আকীদাও পোষণ করিনা যে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করে গরু মোষের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমরা যেদিকে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবো। কিংবা হিন্দুদের মহাদেবের মতো কেবল তাঁর তপজপ ও বন্ধনা করলেই তিনি খুশী হয়ে যাবেন। বরঞ্চ আমাদের বিশ্বাস এইযে, আল্লাহ তায়ালা যেমন আমাদের বস্তুগত জীবনের উপকরণাদি সরবরাহ করছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের হিদায়াতের জন্য নবী রসূলও পাঠিয়েছেন। তিনি যেমনি তাঁর ইবাদত বন্দেগী করতে বলেছেন, তেমনি তাঁর আনুগত্য করারও আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেই কিংবা পাঁচ

ওয়াক্ত নামায পড়লেই হবেনা, বরং তাঁর ফরমাবরদারী এবং আনুগত্য করাও অপরিহার্য। আর এই আনুগত্য ও ফরমাবরদারী জীবনের কোনো একটা ক্ষেত্রে করলেই চলবেনা বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে করতে হবে। মুসলমান শুধু মসজিদের মধ্যেই আল্লাহর বান্দা হয়না বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাকে আল্লাহর আইন ও হুকুম মেনে চলতে হয়। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমানের ধর্ম কেবল মন্দির ও উপাসনালয়েই ক্ষণিকের জন্য তার সাথে লেপ্টে যায়, অতঃপর সেখান থেকে বেরুনোর পর ঈশ্বর ও ধর্মের সাথে তাদের আর কোনো সংশ্রব থাকেনা। কিন্তু মুসলমানের ধর্ম প্রতি মুহূর্তে তার সাথে সাথে থাকে। মসজিদে, বাড়ীতে, বাজারে, দোকানে, ক্ষেতখামারে, লেনদেনে, রাজনীতিতে, শাসন প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে এক কথায় এমন কোনো কর্মক্ষেত্র নেই, যেখানে আল্লাহর দীন শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় মুসলমানের সাথে থাকেনা। আল্লাহর এই আনুগত্য তাঁর নবীদের আনুগত্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহকে মানার অর্থ যেমন শুধু "আমানতু বিল্লাহ" (আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম) বলা নয়। বরং আল্লাহকে আইনদাতা, মালিক ও শাসক বলে স্বীকার ও বরণ করা, তেমনি রসূলকেও শুধু রসূল বলে স্বীকৃতি দিলেই তার রিসালাতের ওপর ঈমান আনা সম্পন্ন হয়ে যায়না। আমরা যদি কেবল রসূলকে রসূল বলে স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হই, তবে মদীনার মুনাফেকরা এ কাজে আমাদের চেয়ে পেছনে ছিলোনা। তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলতো যে, আপনি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেননি, বরং বলেছেন যে, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল, কিন্তু মুনাফেকরা মিথ্যুক, ওরা ওদের স্বীকৃতিতে সত্যবাদী নয়।

রিসালাতের প্রতি ঈমান

কারণ রসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ তো তাঁর আনুগত্য করাকে বাধ্যতামূলক বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিনিধি ও রসূল হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়া। তাঁর আনীত বিধান ও তাঁর আদর্শের বিপরীত সব কিছুকে অস্বাভাবিক ও আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ বলে বিশ্বাস করা। এ ধরনের প্রতিটি বিদ্রোহাত্মক আচরণের সাথে স্বভাবসুলভ শত্রুতা পোষণ করা এবং যা কিছু রসূলের আদর্শের পক্ষে তার সাথে স্বভাবসুলভ ও মজ্জাগত ভালোবাসা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ–

"আমি প্রত্যেক রসূলকেই শুধু এজন্য পাঠিয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে।"[১]

১. সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৬৪।

সুতরাং রসূলের নাম শুনতেই আংগুলে চুমু খেয়ে চোখে লাগালে, মিলাদের অনুষ্ঠান করলে, কিংবা রসূলের নামে পতাকা হাতে নিয়ে সড়ক ও অলিগলিতে মিছিল বের করলেই রসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়না। প্রকৃতপক্ষে রসূলের অধিকার হলো, তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে রসূল ব্যতীত আর কারো আনুগত্য স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়া আল্লাহ ও তাঁর রসূল উভয়কেই অমান্য করার শামিল। জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মেনে নিতে হবে। এটা না মেনে হাজারো মিলাদ অনুষ্ঠান এবং লাখো পতাকা নিয়ে মিছিল করে যদি কেউ মনে করে যে, সে রসূলের প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে এবং তাঁর সুপারিশ লাভের অধিকারী হ'য়ে গেছে তবে সে ধারণা মিথ্যা। কেউ যদি সারাদিন দরুদ পাঠ করে, মিলাদ মাহফিল করে এবং রসূলের জন্য পতাকা মিছিল করে, অথচ বাস্তব জীবনে রসূলের শিক্ষাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এবং সারা জীবন তাঁর বিরুদ্ধে চলে, আর আশা করে যে, সে অনায়াসে জান্নাতে চলে যাবে, তবে আমি পূর্ণ দায়িত্বসহকারে বলতে পারি যে, এর চেয়ে মিথ্যা আশা আর কিছুই হ'তে পারেনা। আপনাকে বলপ্রয়োগে রসূলের আনুগত্য থেকে হটানো যেতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেচ্ছায় রসূলের আনুগত্য থেকে বিরত হন এবং তাঁকে অনুসরণীয় বলে মনে না করেন, তাহলে রসূলকে রসূল বলে স্বীকার করাতে কোনো লাভ নেই। মনে রাখবেন, রসূলের শিক্ষা ও নির্দেশে সন্দেহ পোষণ করা মুনাফেকী এবং তাঁর আনীত বিধান ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করা কুফরী।

আল্লাহ যে দীন আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার নাম রেখেছেন ইসলাম। ইসলামের অর্থ হলো, নিজেকে সর্বতোভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। কুরআনে এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً "আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করো।"[২]

এরমানে জীবনকে খন্ডিত করার অধিকার আপনার নেই। জীবনের প্রতিটি বিভাগে ইসলামের আনুগত্য করতে হবে। ব্যবসায় করুন, চাকুরি করুন, শিক্ষকতা করুন, কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করুন, বাড়ীতে থাকুন বা সমাজে বিচরণ করুন, আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে অথবা স্বদেশী বিষয় নিয়ে তৎপরতা চালান সবকিছুতেই আল্লাহর দীনের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সপেঁ দিতে হবে। একেই বলে ইসলাম। আর এই অর্থে যে ইসলামের ধারক বাহক হয়, সে-ই মুসলিম। ইসলামী জীবন থেকে বিচ্যুতি বল প্রয়োগের ফলে, প্রবৃত্তি বা রিপুর তাড়নার বশে অথবা অজ্ঞতার কারণে হ'তে পারে, যেমন

২. সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২০৮।

কেউ বাধ্য হয়ে ও অনন্যোপায় হয়ে শুকরের গোশ্‌ত খেয়ে নিতে পারে। কেউ রিপুর তাড়নায় কোনো অবৈধ কাজ করে ফেলতে পারে অথবা অজ্ঞতা বা উদাসীনতাবশত কোনো নোংরামিতে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। প্রথমটির বেলায় মানুষের কর্তব্য হলো ঐ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। দ্বিতীয় অবস্থায় তার কর্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করা। তৃতীয় অবস্থায় নিজেকে যতশীঘ্র সম্ভব পবিত্র করা তার কর্তব্য। কিন্তু সে যদি নোংরা আবর্জনার স্তূপের ওপর বিছানা বিছিয়ে সেখানেই নিজের সন্তান জন্ম দিতে আরম্ভ করে, সেখানেই নিজের বংশধরের বিকাশ বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে এবং এই ভেবে গর্ববোধ করতে থাকে যে, সে একটা প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছে, আর আপনারাও যদি তাকে চমৎকার মুসলমান মনে করেন, তবে সেটা হবে একটা ভুল ধারণা। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মনমগজকে পবিত্র করে নিন। কেননা এর ভ্রান্ত হওয়াটা সর্ব স্বীকৃত। এ নিয়ে কেবল একজন নির্বোধই সন্দেহ পোষণ করতে পারে।

কিতাবের প্রতি ঈমান

রসূলের আল্লাহ তায়ালা কিতাবও পাঠিয়েছেন। এটা কোনো তন্ত্রমন্ত্রের কিতাব নয়। অমুসলিমেরাও স্বীকার করে যে, আকাশের নীচে যে কয়টি গ্রন্থ পৃথিবীতে বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত করেছে আল কুরআন তারই একটি। প্রকৃত ব্যাপার এইযে, এ কিতাব পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত করেছে। বিশ্ব মানবের উত্থান ও পতনের মানদন্ড হয়ে এসেছে এই কুরআন। বিশ্বের চরম অধোপতিত আরব জাতিকে এই কুরআন দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতা বানিয়ে দিয়েছে এবং অন্যসকল বড় বড় জাতির ক্ষতিকর সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছে। যারা উট চরিয়ে বেড়াতো, কুরআন তাদের হাত থেকে উটের লাগাম কেড়ে নিয়ে তাদের হাতে দুনিয়ার মানুষের নেতৃত্বের লাগাম ধরিয়ে দিয়েছে। এই কুরআনেরই প্রেরণায় এই উট পালকদের মধ্য থেকে এমন এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের নামে গোটা মানবেতিহাস গৌরবান্বিত হয়েছে। এ কিতাব আমাদের জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য পথনির্দেশিকা হয়ে এসেছে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ ও ফরমান এবং সন্দেহাতীতভাবে অবশ্য পালনীয়। কোনো মুসলমান জেনে শুনে ও স্বেচ্ছায় এ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেকে মুসলমান হিসেবে বহাল রাখতে পারেনা। যতোক্ষণ সে বেঁচে থাকবে, এর ওপর অবিচল থাকবে। আর যদি অজ্ঞতাবশত বিপথগামী হয় তবে চেতনা ফিরে আসা মাত্রই সে ফিরে আসবে। আর যদি বলপ্রয়োগে তাকে এই কিতাবের অনুকরণ ও অনুসরণ থেকে ফেরানো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হবে পানি থেকে মাছের দূরে থাকার মত। সে কোনো

অবস্থাতেই স্বেচ্ছায় এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারেনা। চাই তাতে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, কিংবা এই পথে তার সবকিছু হারাতে হোক।

এই মহাগ্রন্থের সাথে আমাদের সম্পর্কের ধরন শুধু এই নয় যে, তা কখনো মাটিতে পড়ে গেলে তার সমান ওজনের গম সদকা করে দেয়া হবে। তার জোযদান খুবই মূল্যবান মখমলের হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলমারীতে তাকে তুলে রাখা হবে এবং মুমূর্ষ মানুষের ওপর সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দেয়া হবে। কুরআন শুধু সহজে প্রাণ নির্গমনের সহায়ক হয়ে আসেনি, বরং মানুষের জন্য হিদায়াত ও জীবনের উৎস হয়ে এসেছে। সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণেও পৃথিবী ততোটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হবেনা, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়লেও পৃথিবীতে তেমন কোনো প্রলয় ঘটবেনা। কিন্তু কুরআন পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হলে পৃথিবী আর কোথা থেকেও আলোক লাভ করতে পারবেনা।

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ فَمَالَهٗ نُوْرًا مِنْ نُوْرٍ-

"আল্লাহ যার জন্য আলোর ব্যবস্থা করেননা, তার জন্য আর কোথাও আলো থাকবেনা।"[৩]

বস্তুত আল-কুরআন হচ্ছে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সততা, সুখসমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের উৎস। জনৈক স্পর্ধিত ব্যক্তি বলেছিল যে, "পৃথিবীতে যতোদিন কুরআন আছে, ততোদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা" তার জবাবে আমি বলবো, এই কিতাব যদি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, তবে যতো বড় প্রলয় কান্ডই ঘটুক না কেনো, পৃথিবী থেকে শান্তি, সততা ও ন্যায়বিচার কখনো বিলুপ্ত হবেনা। আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের নিকট কুরআনের দাবি এইযে, আমরা যেনো কুরআনকে শিখি, তার ওপর যথার্থ ঈমান আনি, তদনুসারে কাজ করি, এর শিক্ষা, এর ইঙ্গিত চরিত্রকে যেনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তর করতে পারি এবং প্রয়োজনে এর জন্য জীবনোৎসর্গ করি। এগুলো হচ্ছে ইসলামের সর্বসম্মত মর্মবাণী। আমি আগেই বলেছি, আমাদের ঐক্য রক্তের ভিত্তিতে নয়, বরং কুরআনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি কুরআনকে মানে সে আমাদের লোক এবং আমরা তার লোক। আর যে ব্যক্তি কুরআন মানে না সে আমাদের কেউ নয়। আমরাও তার কেউ নই।

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে কিছু কিছু পাঠ্য বিষয় ঐচ্ছিকও হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনে কোনো ঐচ্ছিক আয়াত নেই। আমাদের পুরো কুরআনের অনুসরণ করতে হবে। এর একটি শব্দও অস্বীকার করা গোটা কুরআনকে অস্বীকার করার

৩. সূরা ২৪ আন নূর ঃ ৪০।

শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুখাপেক্ষী নন যে, আমরা তার নির্দেশ অনুসারে যতোটুকুই চলি, তাতেই তিনি খুশী হয়ে যাবেন। আমরা যদি পুরো কুরআন না মেনে তার শতকরা ৫০ ভাগও মানি, তাহলে তিনি যে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তা নয়। রসূল সা. গোটা কুরআন পেশ করার নির্দেশ পেয়েছেন। কুরআনকে যদি কারো গ্রহণ করতে হয়, তবে তা তাকে পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করতে হবে, নচেত পুরোপুরিই বর্জন করতে হবে। আপনাদের তো জানা আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফত আমলে কিছু লোককে মুরতাদ আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত কেনো নেয়া হয়েছিল। তারা তো শুদু যাকাতই দিতে অস্বীকার করেছিলো। সাহাবায়ে কিরামের বৈঠকে বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হলো। হযরত আবু বকর রা. বললেন ঃ তারা যদি যাকাত হিসেবে প্রাপ্য একটি ছাগলের বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আর কেউ যদি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হয়, তবে আমি একাই তরবারী নিয়ে বেরুবো। সকল সাহাবী তাঁর সাথে একমত হন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইসলামের বিধানসমূহে কোনো বিভাজন গ্রহণযোগ্য নয়।

হক ও বাতিলের লড়াইতে আমাদের কর্তব্য

এইসব সর্ববাদী সম্মত মূলনীতিকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই ইসলামের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রমাণিত হয়। এসব মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সহজ ব্যাপার নয়। শয়তান আমাদেরকে প্রলোভন ও ভয় দেখানোর মাধ্যমে নিরন্তর কুপ্ররোচনা দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য বানাতে সচেষ্ট। কিন্তু অন্তত এইটুকু হিম্মত দেখানো আমাদের কর্তব্য, যাতে শয়তান ঘাবড়ে যায়। একেবারে কাপুরুষের মতো তার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেবো, আবার ধর্মপ্রাণ মুসলমান হবার দাবিও করতে থাকবো, এ কেমন কথা? আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক রাখবো আবার শয়তানের সাথেও সখ্যতা বজায় রাখবো, এটাতো চলতে পারেনা। এ প্রসংগে একটা কৌতুক মনে পড়ছে। এক ব্যক্তি মুসলমান হবার পরও মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাত জোড় করে নমস্কার করতো। এটা দেখে আরেক ব্যক্তি তাকে বললো ঃ মুসলমান হওয়ার পর এমন কাজ করা ভালো নয়। সে বললো ঃ "আরে ভাই, কারো সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করা সমীচীন নয়।" ইসলামে এই আপোষকামিতার অবকাশ নেই। হযরত ঈসা আ.বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সমর্থক নয়, সে আমার শত্রু" এই কথাটা যদি একজন ইংরেজ বলতে পারে, তবে আমরা কেন বলতে পারিনা?

হক ও বাতিলের লড়াই আবহমানকালের। বাবা আদমের আমল থেকেই তা চলে আসছে। এ লড়াই বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং বস্তুগত সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। আমরা যে একই সাথে আল্লাহ ও শয়তান উভয়কে সন্তুষ্ট করতে পারিনা, সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, ইসলামের এই অবিসংবাদিত মূলনীতিগুলোর দাবি কি বর্তমানে মুসলমানরা পূরণ করছে? আমরাতো ফুল বিছানো রাস্তা দিয়ে বেহেশতে যেতে চাই। অথচ রসূল সা. বলেছেন ঃ "বেহেশত দুঃখ কষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত।" সুতরাং জান ও মালের সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আরাম আয়েশের জীবন যাপন কোনো মানুষের পক্ষে কেবল তখনই সম্ভব যখন তার কোনো নীতি বা আদর্শের বালাই থাকেনা। কিন্তু যখনই সে কোনো আদর্শ গ্রহণ করবে, অমনি তার জীবনপথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে উঠবে। কাজেই হয় স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করুন, নচেত একটা আদর্শকে অবলম্বন করে তার পেছনে জান মাল সবকিছু উৎসর্গ করুন। দুই আর দুই মিলে চার হয় এ কথা যেমন সত্য, আর্দশবাদী জীবনের জন্য অগ্নি পরীক্ষার অনিবার্যতাও তেমনি সত্য। এই অবিসংবাদিত সত্যটা মেনে নিলে আমাদের সমস্ত হিসাব মুহূর্তের মধ্যেই মিলে যেতো। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, দুই আর দুই মিলে চারও হয়, ছয়ও হয় এবং আটও হয়, তাহলে সারা জীবন বসে অংক কষলেও আমাদের হিসাব মিলবেনা।

মুসলমানের প্রকারভেদ

বর্তমানকালের মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তারা অসংখ্য প্রকারের। সাপ কত প্রকারের আপনি তাও গুণে শেষ করতে পারবেন, কিন্তু মুসলমান কত প্রকারে তা গুণে শেষ করতে পারবেননা। অথচ মুসলমান এতো প্রকারের হওয়ার কথা নয়। মুসলমান শুধু একই প্রকারের এবং তা হচ্ছে আল্লাহ ও আল্লাহর শরীয়তের অনুগত এবং রসূল সা. ও তাঁর সুন্নাতের অনুসারী। এই সর্বসম্মত সত্যকে মানা, আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পরস্পর বিরোধী কাজ। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, এ যুগে খুব কম লোকই এই স্ববিরোধীতা সম্পর্কে সচেতন।

মুসলমানরা যে সত্য ও অকাট্য আদর্শের অনুসারী, দুনিয়ার আর কোনো জাতি তেমন নিখুঁত আদর্শের অনুসারী নয়। এতদসত্ত্বেও আমরা এমন বেঘোরে ঘুমোচ্ছি যে, আমাদের শত্রুরাও তা দেখে হতবাক হচ্ছে। যে আদর্শই কেউ গ্রহণ করেছে তাকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়েছে। বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল বর্তমান পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি দিলেই চলবে। যারা গণতন্ত্রকে

নিজেদের আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এ জন্য কত মূল্য দিতে হয়েছে তাকিয়ে দেখুন। কেউ স্বৈরতন্ত্রকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর সংগে সংগেই তাকে জান ও মালের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। রাশিয়া যেই বললো যে, সমাজতন্ত্রেই বিশ্বের কল্যাণ নিহিত, অমনি গোটা দেশ তছনছ হয়ে গেলো।

নাৎসিবাদকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিলে এতো জীবন বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন হয়। সমাজতন্ত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয় এবং গণতন্ত্রের বেদিতে এতো মানুষের জানমাল উৎসর্গ করতে হয়। অথছ আপনি আল্লাহ ও তার সত্য দীনকে মেনে নিয়ে প্রাচীন কিতাবের ভাষায় 'পর্বতের প্রদ্বীপ' ও 'মাটির লবণ' আর কুরআনের ভাষায় বিশ্বের সেরা জাতির উপাধিতে ভূষিত হবেন, অথচ একটা কাঁটার খোঁচাও খাবেন না, এটা কিভাবে সম্ভব? যে পথে খুশী চলবেন অথচ কোনো আদর্শ লংঘিত হবেনা এটাতো সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। এ যুগের শিক্ষিত অমুসলিমরাও যারা কোনো না কোনো মতাদর্শের অনুসারী ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে যে, এতো বড় একটা আদর্শিক ভান্ডার যে মুসলমানদের মুঠোর মধ্যে রয়েছে, তারা কিভাবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে?

এই যদি হয়ে থাকে সর্বস্বীকৃত আদর্শ এবং আপনারা যদি এটিকে মেনে নিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমে নিজে তা গ্রহণ করুন। অতঃপর অন্যদের কাছে তা প্রচার করুন। এর জন্য আপনাদের ঘরে, বাইরে, শহরে, বন্দরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে প্রানান্তকর পরিশ্রম করতে হবে। বাতিল ও মিথ্যা আদর্শের জন্য যখন লক্ষ কোটি মানুষের মাতৃভূমি, ঘরবাড়ী আপনজনকে ত্যাগ করা এবং স্বয়ং শত্রুর দেশে হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামার হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে, তখন কেবল সত্য দীন কি এতো মযলূম থেকে যাবে যে, তার জন্য সামান্য একটা আঘাত সহ্য করারও কেউ থাকবেনা? তার জন্য এক ফোটা রক্ত ঝরাবার কেউ থাকবেনা? তার জন্য খরচ করার একটি পয়সাও কারো পকেটে থাকবেনা? বাতিলের জন্য যেখানে দুনিয়া এতো উদগ্রীব, সেখানে সত্যের প্রতি কিছুমাত্র আগ্রহ কারো থাকবেনা, এ কেমন কথা? সত্য কি কোনো কিছুরই দাবি জানায় না এবং কোনো কিছুই কি তার প্রাপ্য নয়? আল্লাহ ও রসূলের আদর্শকে যারা নিজেদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে, সেই মুসলমানরা আজ কোথায় ঘুমিয়ে আছে? হয় বলুন যে, এটা কোনো মহৎ কাজ নয়, তাই এতে আমাদের আগ্রহ নেই। নচেত এটা যদি মহৎ কাজ হয়ে থাকে বরং প্রকৃতপক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় মহৎ কাজ, তাহলে বলুন এই মহান কাজে ব্রতী একটি সংগঠনও যে পৃথিবীতে গঠিত হলোনা, এজন্য আমরা কিয়ামতের দিন কি জবাব দেবো? আংশিক সত্য নয়, বরং সমগ্র সত্য ও ন্যায়কে লক্ষ্য বানিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা চাই। কেননা পৃথিবীতে কোনো দল

এমন থাকতে পারেনা, যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য ও ন্যায় অন্তর্ভুক্ত নেই সত্য ন্যায়ের লেশমাত্র নেই, এমন দলের অস্তিত্ব অসম্ভব। পৃথিবীতে নির্ভেজাল বাতিল ও অন্যায় বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। এমনটি হওয়া বিশ্বপ্রকৃতির রীতি ও মেযাজের পরিপন্থী। কিন্তু আমরা যেটা চাই, তা হচ্ছে এমন একটি দল, যা সমগ্র সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ থাকবে, যেমন সাহাবায়ে কিরাম সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশ্য

আমরা জামায়াতে ইসলামী নামে যে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলেছি তার উদ্দেশ্য এটাই। যেসকল মুসলমান সমগ্র ইসলামকে বাস্তবায়িত করতে সংকল্পবদ্ধ থাকবে, তাদেরকেই আমরা বেছে বেছে সংঘবদ্ধ করতে চাই। এভাবে আমরা ইসলামের সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট, যা কেবল সামষ্টিক জীবনে পূর্ণ হতে পারে। এ আন্দোলন এখনো সূচনাপর্বে এবং দুর্বল। কিন্তু এটি যদি সংগঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ এতে শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন, তাহলে বিচিত্র নয় যে, এই দুর্বল দলের দ্বারাই এমন কাজ সম্পন্ন হবে, যে কাজ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই কাজের যথার্থ সেবকরূপে গড়ে তুলুন।

যে কথাগুলো আমি বললাম, তাতে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। তর্ক করার জন্য প্রত্যেক্যের মুখেই জিহ্বা আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এগুলো তর্কাতীত বিষয়। এই নির্ভেজাল উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত কোনো দল ছিলোনা। এটা বড়ই মর্মপীড়াদায়ক ব্যাপার যে, একেবারেই বাতিল ও অন্যায় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দল থাকবে এবং তার জন্য বিরাট বিরাট ত্যাগ ও কুবরানী করা হবে। কিন্তু পৃথিবীতে যে উদ্দেশ্যটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহৎ, তার জন্য কোনো দল থাকবেনা এবং কোনো তৎপরতা, ত্যাগ ও কুরবানী হবেনা। এই মহোত্তম ও বৃহত্তম উদ্দেশেই আমরা আল্লাহর কতক বান্দা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমরা জানতাম, আমাদের বুঝতে ও মানুষকে বুঝাতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ একদিন অবশ্যই এর গুরুত্ব বুঝবে। আমাদের নিয়ত যদি খালিছ এবং উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তবে শয়তান যখন তার বাহিনী নিয়ে ময়দানে আসবে, তখন আমরাও সত্যের সৈনিকদের সাথে নিয়ে তাদের মুকাবিলা করবো। মহানবী সা. হাজার হাজার লৌহবর্মাচ্ছাদিত সশস্ত্র সৈনিকের মুকাবিলায় তিনশো তেরজন নিরীহ ও নিরস্ত্র সৈনিক দাঁড় করিয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ তাদেরই মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করেছিলেন। আমরাও মহানবীর অনুকরণে বাতিলের মুকাবিলা করবো ইনশাআল্লাহ, তা আমাদের শক্তি যতো তুচ্ছই হোক না কেন।

এরপর আমরা যদি জয় লাভ করি তাহলে তো সেটাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু যদি অন্য কিছু ঘটে যায়, তাহলেও সত্যের পথে কোনো ব্যর্থতা নেই। পৃবিথীর সকল পথের মধ্যে একমাত্র সত্যের পথই এমন, যেখানে ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠেনা। এখানে প্রথম কদমেও সাফল্য, শেষ কদমেও সাফল্য। নিষ্ফলতা এর ধারে কাছেও নেই। প্রয়োজন শুধু এটাকে মেনে নেয়া এবং এর ওপর চলা অব্যাহত রাখার অবিচল সংকল্প। অতঃপর পথ চলার জন্য যদি মোটরগাড়ী মিলে যায়, তবে ভালো কথা। নচেত ঠেলাগাড়ী, রিক্সা যাই পাওয়া যায়, তা দিয়েই এ পথ অতিক্রম করতে হবে। তাও যদি না জোটে তবে দুটো পা রয়েছে, তা দিয়েই চলবো। পাও যদি না থাকে, তবে দুই চোখ দিয়ে গন্তব্যের নিদর্শনগুলো দেখবো। যদি চোখও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসে তবে হৃদয়ের চোখতো রয়েছে, যার দৃষ্টিশক্তি কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনা যদি ঈমান বহাল থাকে।

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

"আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য। যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।"[৪]

কাজের উপকরণ ও পথের পাথেয়ের প্রশ্ন আমাদের কাছে একেবারেই গৌণ।

সাফল্যের মাপকাঠি

অন্যান্য আন্দোলনে লক্ষ্য অর্জনের পথে কতদূর পৌছলাম, পথের সম্বল কি আছে এবং গন্তব্য আর কতদূর? এসব-ই দেখা হয় এবং এভাবেই সাফল্যের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি হলো, নিয়তের সততা ও আন্তরিকতা কতটুকু ছিলো, কতদূর এলাম তা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রথম কদমে যদি মৃত্যু এসে যায় তাহলেও সাফল্য আসবে। আর গন্তব্যে পৌছলে তো কথাই নেই। এই সফরে নির্ভেজাল ঈমানই পাথেয় এবং স্থির সংকল্প এ সফরের বাহন। যারা এই পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে তারা সফল হয়েছে। যারা এখনো বেঁচে আছে, তারা যেদিন জান দেবে সেদিন সফল হবে।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً-

"মুমিনদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ জীবন উৎসর্গ করেছে, কেউ অপেক্ষা করছে। তবে তারা ওয়াদা ভঙ্গ করেনি।"[৫]

---

৪. সূরা ৬ আল আনআম ঃ ১৬২।

৫. সূরা ৩৩ আল আহযাব ঃ ২৩।

সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব করবেননা। আমি "শতকরা" শব্দটাকে খুবই ঘৃণা করি। এ কাজ আমাদের করতেই হবে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হয় তো হোক। দুনিয়ায় সত্যকে কবেই বা সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে? সত্যের পথিকরা চলতে আরম্ভ করেছে, আর তাদের পেছনে রক্ষীরা "রাস্তা ছাড়" বলে হাঁক ডাক করতে থেকেছে   এমন দৃষ্টান্ত কোথায়? সত্যের পথে তায়েফ, সূর পর্বতগুহা, বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি আসবেই। সত্যের জন্য রসূলের পথে কাঁটা বিছানো হয়েছে, তাঁর দাঁত ভেংগে দেয়া হয়েছে, মাথার ওপর ভুড়ি ফেলে দেয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রকারের কষ্ট দেয়া হয়েছে। আমাদের যদি এ কাজে একটা হাড়ও না ভাংগে, তবে তো আমরা হতভাগা। সত্যের পথে চলতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি, ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? ইতিহাসের যে পাতায় এ ধরনের কোনো বাধার উল্লেখ নেই, তা আনুন তো দেখি, আমি তাতে চুমু খাবো।

ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা বিপত্তি এবং সমস্যা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে ব্যর্থতার কোনো অস্তিত্বই নেই। এক কদম সামনে এগুতে পারলেও সাফল্য নিশ্চিত। এমন কি সেচ্ছায় না পালালে পিছু হটাতেও সাফল্য আসে। সত্যের সংগ্রামীরা পরাজয়ও বরণ করেছেন। কিন্তু সেই পরাজয় হাজার বিজয়ের চেয়েও উত্তম।

শয়তানের সাথে পুরো সহযোগিতা করা হবে, আবার দোয়া করা হবে যে,

رَبَّنَا ثَبِّتْ اَقْدَمَنَا– "হে আমাদের প্রভু! আমাদের কদমকে দৃঢ় রাখো।" এটা নিদারুণ হাস্যকর ব্যাপার। এই দোয়ার প্রতিক্রিয়া কি, তা জানে সেই ঈমানদার ব্যক্তি, যার ঘাড়ে নাড়িভুড়ি নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, এবং যার আপাদমস্তক তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছিলো। তিনি যখন বলেন, رَبَّنَا ثَبِّتْ اَقْدَمَنَا– তখন পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়। আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে একটি কথাও নিরর্থক বলেননি। ভাবুন তো, কেউ যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে পালায়, আর দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার শক্তি দাও, তাহলে তার এ দোয়া কত নিরর্থক হবে। যা হোক, আমরা সত্যের এই পথেই সবাইকে ডাকছি। এখন কেউ যদি আমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তবে তার কোনো প্রতিকার আমাদের কাছে নেই। তবে ভালো করে শুনে রাখুন, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ছাড়া আমাদের আর কোনো আহ্বান নেই এবং রসূলের সুন্নাত ছাড়া আমাদের আর কোনো সুন্নাত নেই। বইপুস্তক সর্বত্র বিদ্যমান। ভুল দেখলে ধরে দিন। শুধরাতে কখনো অস্বীকার করবোনা। আল্লাহ ও রসূলের শিক্ষার আলোকে যে কোনো ব্যক্তি আমাদের ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করতে পারে। আল্লাহ ও রসূলের উক্তি ছাড়া আর সব উক্তি

আমাদের কাছে মূল্যহীন ও পরিত্যাজ্য। আমরা আমাদের পথ স্বচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যদি আমাদের সাথে চলতে সম্মত থাকেন, তবে আপনাদের ধন্যবাদ। কেননা এটা আপনাদের কর্তব্য। আমরা আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি না। আমাদের আন্তরিক আকাংখা এ দাওয়াতে সাড়া দিন। কোনো মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো আকাংখা থাকতে পারেনা।

প্রকৃত ব্যাপার এইযে, আমরা মুসলমানরা স্বয়ং ইসলামের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে গেছি। আমরাই ইসলামকে নিজ হাতে যবাই করি, আবার আমরাই ইসলামের উত্তরাধিকারী হয়ে গেছি। অথচ আমরা আলাদা কোনো জাতি ছিলামনা। যে সত্যের বন্ধু, সে আমাদেরও বন্ধু। যে সত্যের দুশমন, সে আমাদেরও দুশমন। আমরা আল্লাহর দীনের ধারক ও বাহক ছাড়া আর কিছু নই। বিশ্ববাসী যেদিন বুঝবে যে, আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় ছাড়া আর কিছু চাইনা, সেদিন দেখবেন যে, আমাদের জন্য দুনিয়াটা পাল্টে গেছে। আমাদের জন্য সেদিন পাষাণ হৃদয়ও গলে যাবে এবং বধিরদের কানেও শ্রবণ শক্তি ফিরে আসবে। সত্য যদি উন্মুক্ত ও নির্ভেজালভাবে ধরা দেয়, তবে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও ভালোবাসা শাশ্বত ও মজ্জাগত।

আল্লাহর সাহায্য কখন আসে?

সুধিমন্ডলী! এ কথা কখনো মনে করবেন না যে, আমরা ইসলামকে চাই বা না চাই, আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের শক্তি দ্বারা তাকে পৃথিবীতে চালু ও প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। আল্লাহর দীন কায়েম করা তো একটা ইবাদত। আর ইবাদত মানে গোলামী, যা গোলামদের কাজ। এটা আল্লাহর কাজ নয়। আমরা যেমন নামায না পড়লে বা রোযা না রাখলে আল্লাহ্ আমাদের পক্ষ থেকে নামায পড়বেন না ও রোযা রাখবেন না, যাকাতও দেবেন না, হজ্জও করবেন না এবং নিজের অন্য কোনো হুকুমও পালন করবেন না, তেমিন আমরা ইসলাম কায়েম না করলে আমাদের পক্ষ থেকে ওটাও তিনি করবেন না। এসব আমাদের করণীয় কাজ। তবে একথা ঠিক যে, আমরা যদি এসব কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের প্রিয়তম জিনিসগুলোর ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা আমাদের সাহায্য করবেন। সুতরাং আল্লাহ নিজেই সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেবেন একথা ভেবে তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকবেন না। এর জন্য তো আমাদেরকেই সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হতে হবে। আমরা যখন এই পথে আমাদের সবকিছু হারাবো, তখন এই ত্যাগের জন্য আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার নির্দিষ্ট রয়েছে, তা আমরা পাবো। বস্তুত সেই পুরস্কার খুবই বড় সম্পদ।

ইসলাম কায়েমের পথে সর্ব প্রথম কাজ হলো, প্রথমে আমাদের প্রত্যেককে নিজের সাথে লড়াই করে নিজের ওপর আল্লাহর আনুগত্য বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং নিজেকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করতে হবে। যারা এই পথে নিজের প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পেরেছে, আল্লাহর পথে তারাই লড়তে পারে। এ কাজ কেবল ফরম পূরণ করলে হয়না। এ জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। নিজের জীবনের হিসাব নেয়া এবং নিজের ওপর আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করা কোনো সহজ কাজ নয়। অধিকাংশ মানুষ নিজের প্রবৃত্তির কাছেই পরাজিত হয়। তার ভেতরকার শত্রু তাকে খুব অল্প সময়েই কুপোকাত করে ফেলে। তাই সর্বাগ্রে নিজের ওপর জয়লাভ করা জরুরী।

যেসকল নোংরা জিনিস সেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছেন, সেগুলো অবিলম্বে দূর করে দিন। আর যেসব জিনিস আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার ওপর চড়াও হয়েছে, তা দূর করার জন্য সামষ্টিক সংগ্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। আপনার জীবন যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আপনি যদি নিজের ওপর দীন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে সক্ষম হন, তবে আপনার চোখের ইশারায় এতো বড় বড় কাজ হবে, যা বড় বড় প্রবন্ধ লিখলেও হয়না। আপনাকে যা কিছু বলতে হবে বাস্তব কাজের ভাষায় বলতে হবে। মুখের ভাষায় খুব কমই বলতে হবে। আপনাকে আপনার লক্ষ্যের বাস্তব আহ্বায়ক ও মুখপত্র হতে হবে।

একটি কথা মনে রাখবেন। আমরা যে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছি, সেটা মোটেই গর্বের ব্যাপার নয়। আমাদের আল্লাহর শোকর করতে হবে যে, তিনি আমাদের মনে তাঁর দাসত্ব ও ইবাদতের মহৎ ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন এবং সেজন্য কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। গর্ব ও অহংকার থেকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং সবসময় আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিয়ে থাকা উচিত। সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক, প্রত্যেকটা সংকল্পেরই পরীক্ষা নেয়া হয়। আপনার ইচ্ছা ও সংকল্পকেও আজ হোক কাল হোক পরীক্ষা করা হবে। যে কাজ আপনারা করতে চলেছেন, পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। এ কাজে বক্রমনা ও অপরিপক্ক লোকদের কোনো স্থান নেই। এ পথে সাফল্যের চেয়ে বিপদ আপদ ও বাধা বিপত্তির জন্য বেশী প্রস্তুত থাকা উচিত। প্রশংসা ও ধন্যবাদের চেয়ে নিন্দা সমালোচনার জন্য বেশী প্রস্তুত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পথে প্রশংসা ও মুবারকবাদ কেবল আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া যায়। আল্লাহর প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য যারা হয়, তারা যথার্থই ভাগ্যবান। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা চাই। আমাদের ও অন্যান্য ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে কুফর ও ইসলামের পার্থক্য বিরাজ করেনা। আমাদের ও তাদের মধ্যে যে পার্থক্য, তা হলো পূর্ণ ইসলামের ও আংশিক ইসলামের এবং

কর্মপদ্ধতির পার্থক্য। এ পার্থক্য কিছুদিন অব্যাহত থাকবে এবং এ কারণে কিছু ভুল বুঝাবুঝি ও খারাপ ধারণাও জন্মে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি দৃঢ়ভাবে নিজেদের লক্ষ্যের ওপর অবিচল থাকি এবং খুটিনাটি বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ি, তাহলে এসব ভুল বুঝাবুঝি আপনা আপনিই দূর হয়ে যাবে। মানুষের সবচেয়ে বড় মনস্তাত্মিক দুর্বলতা এইযে, সে নিজের সমালোচনায় সবসময় আপোষকামিতার আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং নিজেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুবিধা লাভের যোগ্য মনে করে। এ জন্য আমরা যখন লোকদের সমালোচনা করি, তখন তারা ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু সত্য, সত্যিই ভোরের আলো দেখা দিলে রাতের অন্ধকার বেশীক্ষণ থাকতে পারেনা। মানুষের চোখ একদিন খুলবেই এবং প্রকৃত সত্য নজরে পড়বেই। যারা খারাপ ধারণা পোষণের ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকতে ইচ্ছুক নয়, তারা ইনশাআল্লাহ একে একে আমাদের সহযোগী হতে থাকবে। এই ক্ষুদ্র সময়েও যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাতে হতাশার কোনো কারণ নেই। আমরা নিজেদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার খুবই সামান্য পুঁজি এখানে বিনিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা এর ফলে কাজের অনেক পথ খুলে দিয়েছেন। আজ আমাদের যেটুকু যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ইনশাআল্লাহ আরো বড় কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি নিজেকে এক পয়সার জন্য বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে পারে, সে এক লাখ টাকার আমানত গ্রহণের যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ

[১৯৪৫ সালের ১৬ জানুয়ারি সংখ্যায় লাহোর থেকে প্রকাশিত ও মাওলানা কাউসার নিয়াজী সম্পাদিত 'কাওসার' পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের এ লেখাটি প্রথম ছাপা হয়। এটি ছিলো জামায়াত কর্মীদের উদ্দেশ্যে সেক্রেটারী জেনারেলের আহ্বান। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি লেখাটিকে আরো অধিক সমৃদ্ধ করেন এবং পুনরায় নতুন সংস্করণও করেন। - সম্পাদক]

প্রিয় সাথীবৃন্দ !

সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনের অবকাশ প্রতি মুহূর্তে কমে আসছে। পৃথিবীতে আমাদের জন্য যে সময়টুকু বরাদ্ধ ছিলো, তা আরো এক বছর কমে গেছে এবং হিসাব দেয়ার দিন একবছর আরো এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা খুব কম লোকই অনুভব করছে এবং জীবনের মূল লক্ষ্য উপলব্ধি করা ও তা অর্জন করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। মানুষের এই উদাসীনতা ও অপরিণামদর্শিতার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ-

'মানুষের হিসাবের সময় ঘনিয়ে এলো, অথচ তারা উদাসীনতার গড্ডালিকায় ভেসে যাচ্ছে এবং ভোগ বিলাস ছাড়া আর কোনো দিকে তাদের মনোযোগ নেই।" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১)

অতীত জীবনের পর্যালোচনা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! একটু পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয়া, নিজ নিজ অতীত জীবনের পর্যালোচনা করা এবং নিজের লাভ লোকসানের হিসাব নেয়ার এখনো সময় আছে। যে জীবন ও তার উপকরণাদি আমানত হিসেবে গ্রহণ করে অমরা এই দুনিয়ার বাজারে কিছু উপার্জন করতে এসেছিলাম, তার সাথে কী আচরণ করছি, তার কতোখানি আমরা লাভজনক কাজে ব্যয় করছি, কতোখানি আমরা বোকামী করে নষ্ট ও অপচয় করছি এবং কতোখানি আমানত দাতার মর্জির বিরুদ্ধে শুধু নয় বরং তার সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য কাজে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যয় করছি, তা খতিয়ে দেখার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এখনো এটা বিচার বিবেচনা করার সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়নি যে, আমাদের মূল্যবান পুঁজির কতোখানি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে বা আমরা হারিয়ে

ফেলেছি এবং আমাদের দুনিয়ার এই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন আমরা আমাদের সেই মহাজ্ঞানী ও স্রষ্টা মনিবের কাছে হিসাবের জন্য হাযির হবো, তখন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যদি নাও হতে পারি, অন্তত ক্ষমারযোগ্য বিবেচিত হবো? তাই যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখেন এবং আখিরাতের কর্মফলে বিশ্বাসী, তাদের সকলকে সাধারণভাবে এবং যারা 'শ্রেষ্ঠ জাতি' ও 'মানবজাতির উপর সাক্ষী' হবার আকাংখা পোষণ করেন এবং "সৃষ্টি যার বিধান তার" এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত, তাদের বিশেষভাবে নিজ নিজ অতীত জীবনের পর্যালোচনা করে হিসাব করে দেখতে হবে যে, নিজ নিজ জীবনের যেটুকু পুঁজি তারা শেষ করে ফেলেছেন, তার কতোটুকু অংশ আমানতদাতার ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে আমানত দেয়া হয়েছিলো সেই উদ্দেশে ব্যয়িত হয়েছে, আর কতটুকু অংশ তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও অহংকারের বশে তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে ব্যয় করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন।

এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই অত্যন্ত নিখুঁত ও সুক্ষ্মভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, আমাদের দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক যোগ্যতা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টা সাধনা, আমাদের কায়কারবার ও ব্যবসায় বাণিজ্য, আমাদের শত্রুতা ও বন্ধুতা, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ, আমাদের ধন সম্পদ ও জমি জমা এক কথায়, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদত বন্দেগী ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যতোগুলো উপায় উপকরণ ও সহায় সম্পদ দিয়েছিলেন, তা কোন্ কাজে ও কোন্ উদ্দেশে ব্যয়িত ও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। সেগুলোর সব অথবা বেশীরভাগ কি বাতিল ও খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, খোদাবিমুখ ও অহংকারী নেতৃত্বকে স্থিতিশীল করা এবং আল্লাহর পৃথিবীতে ফিৎনা, ফাসাদ, বিপর্যয় ও অরাজকতা ছড়ানোর জন্যই ব্যয়িত হয়েছে? না কি তার কোনো অংশ আল্লাহ ও তার দীনের জন্যও ব্যয়িত হচ্ছে। আর যদি কিছু ব্যয়িত হয়ে থাকে তবে বাতিল জীবন ব্যবস্থা ও নিজের জন্য ব্যয়িত অংশের সাথে তার অনুপাত কি? আখিরাত সম্পর্কে আমাদের যদি আদৌ কোনো চিন্তাভাবনা থেকে থাকে তাহলে আমাদের ঠান্ডা মাথায় হিসাব নিয়ে দেখতে হবে যে, আমাদের সকল বস্তুগত, শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থাকে পরিচালনা ও সংহত করার কাজে কতো খানি অংশ নিয়েছে ও নিচ্ছে, মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং পৃথিবীকে তার অবাধ্যতা, অনাচার ও অরাজকতা থেকে মুক্ত করার কাজেই বা কতোখানি অংশ নিয়েছে ও নিচ্ছে? আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টা সাধনা কৃত্রিম ও মনগড়া জীবিতও মৃত প্রভুদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা ও বহাল

রাখার কাজে কতোখানি নিয়োজিত হয়েছে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে কতোখানি ব্যয়িত হয়েছে ও হচ্ছে? আমাদের কারবার ও বাণিজ্য কতোখানি আল্লাহর দেয়া হালাল হারামের বিধান মেনে চলছে আর কতখানি সেই বিধানের বাইরে চলছে? আমাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতা প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করা ও তাগুতের নৈকট্য লাভের জন্য ধাবমান, না কি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য? আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমরা আল্লাহর মনোনীত পথে চলার এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বাঁচা ও মরার জন্য প্রস্তুত করছি, না কি আমাদের এই প্রিয়তম সন্তানদের "অভিশপ্ত" ও "ভ্রষ্ট" লোকদের পদাংক অনুসরণের জন্য গড়ে তুলছি? আমাদের ধনসম্পদের কতোটুকু অংশ তাগুতের জন্য, কতোটুকু নিজেদের জন্য এবং কতোটুকু সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ব্যয় করছি?

আরো বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, মুসলমানরা তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তির আনুগত্য করতে গিয়ে এবং তাগুতদের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের সমর্থনে কতো রক্ত প্রবাহিত করেছে, কতো শিশুকে এতিম, কতো নারীকে বিধবা, কতো মাকে সন্তান হারা, কতো ভাইকে পংগু এবং কতো মানুষকে ধ্বংস করেছে?[১] অথচ এ কথা সবার জানা যে, মুসলমান শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারাবদ্ধ, আর কারো জন্য নয়।[২] একটু ভেবে দেখুন, জিদ বা উত্তেজনার বশে নয় বরং ঠান্ডা মাথায় এবং আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করুন যে এর প্রতিকারের কি কোনো উপায় আছে? শুধু তাই নয়, এখনও আপনারা ভেবে দেখুন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চব্বিশ ঘন্টা থেকে কয় ঘন্টা এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে কতোটা সম্পদ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছি? কতোটা সময় ও সম্পদ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য উৎসর্গ করছি? আল্লাহ তো আমাদের দায়িত্ব নিম্নরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

---

১. উল্লেখ্য যে, এই নিবন্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেখা হয়েছিলো এবং সে সময় লাখ লাখ মুসলমান ইংরেজ বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে নিয়োজিত ছিলো।

২. সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ "আল্লাহর মুমিনের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।"

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমরাই তো সেই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানব জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে, যেনো তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কোনো মুসলমান যদি ঠাণ্ডা মাথায় কয়েক মিনিটের জন্যও নিজের জীবনের দিকে তাকায়, তাহলে সে নিজেই স্থির করতে পারবে যে, তার স্রষ্টা ও প্রভু তাকে যে আমানতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা সে কতোখানি পালন করেছে? আল্লাহর কাছে তার কি ধরনের প্রতিফল প্রত্যাশা করা উচিত? যে দীন ও ঈমানের সে দাবীদার, তাতে সে কতোখানি সত্যনিষ্ঠ এবং কতোখানি ভণ্ড ও মুনাফিক? সে আরো বুঝতে পারবে তার জীবন, সূরা বাকারার ৮নং আয়াত -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ- البقره ٨

"কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়।" এবং একই সূরার ১৬নং আয়াত ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَارَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ-

"এরা সেইসব লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে এবং তাদের এই ব্যবসায় লাভজনক হয়নি।" এই দুই আয়াতের বক্তব্যের আওতাভূক্ত না কি আওতা বহির্ভূত?

ইসলামের সঠিক ধারণা

সম্মানিত ভাইয়েরা! আল্লাহকে স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মেনে নেয়ার অনিবার্য দাবিই শুধু নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশও এই যে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ-

"ওহে ঈমানের দাবিদারগণ ! তোমরা যদি যথার্থই ইসলামকে গ্রহণ করে থাকো, তবে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের তাবেদারী করোনা।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মানা হবে আর অন্যান্য ব্যাপারে সেচ্ছাচারমূলক কাজ করা হবে, বা অন্য কারো আনুগত্য করা হবে- এটা

আল্লাহর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের আচরণ আল্লাহর ক্রোধ ও গযবকে এত বেশী উস্কে দেয় যে, এরূপ আচরণকারীদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

“তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানো আর অপরাশংকে অমান্য করো? যারা আল্লাহর কিতাবের সাথে এমন আচরণ করে, তাদের পরিণতি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত থাকবে আর কিয়ামতের দিন কঠোরতম শাস্তি ভোগ করবে? মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নন।” (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ . اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

“হে মুমিনরা! তোমরা কেন এমন কথা বলো যা করোনা? তোমরা যা করবে না তা বলবে এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপার। আল্লাহর প্রিয় লোক হচ্ছে তারা, যারা তার পথে শীসাগলানো প্রাচীরের মতো কাতারবন্ধী হয়ে লড়াই করে।” (সূরা আস সাফ্ ঃ ২-৪)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا-

“কোনো মুমিন নারী ও পুরুষের এ অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল স্বয়ং যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা দেন, তখন সে ব্যাপারে তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার রাখবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী যে-ই করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।” (সূরা আযহাব ঃ ৩৬)

অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে বিপথগামী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং কুরআন মজিদে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ

يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! যতোক্ষণ তারা তোমাকে তাদের যাবতীয় বিবাদের চূড়ান্ত নিস্পত্তিকারীরূপে মেনে না নেবে, অতঃপর তুমি যে ফায়সালা করো, তার ব্যাপারে মনে কোনো কুণ্ঠা বোধ না করে অম্লান বদনে মেনে না নেবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবেনা।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

আল্লাহ্ তায়ালার এসব উক্তিরই ব্যাখ্যা করে রসূল সা. বলেছেন ঃ

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ-

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মনের ইচ্ছা আকাংখাকে আমি যে বিধান এনেছি তার অনুগত করে না দেবে।"

কুরআন ও হাদীসের এসব স্পষ্টক্তি থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কিতাবকে জীবনের মৌলিক বিধান হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর রসূলের নেতৃত্বে গোটা জীবনকে পরিচালনা করাই মুসলমান হওয়ার অনিবার্য দাবি। নচেত আল্লাহ ও রসূলের বাস্তব আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া তাওহীদের নিছক মৌখিক স্বীকৃতি একটি প্রমাণহীন দাবি ছাড়া আর কিছু নয়। কলেমায়ে তাওহীদের স্বীকৃতির অর্থই তো এই দাঁড়ায় যে, এরপর থেকে এই ব্যক্তির সমগ্র জীবন ও যাবতীয় কর্মকান্ড তথা আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, স্বভাব চরিত্র, চালচলন, সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগ- সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু হবে কুরআন ও সুন্নাহ আর তার সকল চেষ্টা সাধনা পরিচালিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে ।

সাধারণভাবে যে কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাকে যে, পুরোপুরি গ্রহণ করা উচিত, সে কথা সবাই হৃদয়ংগম করে এবং তদনুসারে সর্বান্তকরণে কাজও করে থাকে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই একই কথা যদি ইসলামের ব্যাপারে বলা হয়, তাহলে আর কেউ তা বুঝতে চায়না। এটা সবাই স্বীকার করে যে, একটা জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার পর তার পুরো উপকারিতা ও কল্যাণকারীতা লাভ করার জন্য মন মগজ, চিন্তা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা থেকে শুরু করে কথা বলার ভাবভংগী ও বেশ ভূষা পর্যন্ত সবকিছুই ঐ জীবন ব্যবস্থা অনুসারে গড়ে তোলা উচিত। পক্ষান্তরে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের রীতি হলো, এর সমস্ত কল্যাণ ও সুফল কেবল তার নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলেই অর্জিত হয়। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজিদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, তিনি শুধু একমাত্র মাবুদই নন, বরং সেই সাথে তিনি সৃষ্টির পালন কর্তা এবং তাদের প্রকৃত শাসক এবং শাসক ও প্রতিপালক হিসাবে তার সাথে কেউ শরীক নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের একটি পূর্ণাংগ জীবন

ব্যবস্থা দিয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ– "হে ঈমানদাররা, তোমরা পুরোপুরিভাবে (অর্থাৎ জীবনের সকল দিক ও বিভাগসহ) ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করোনা।" (সূরা আলা বাকারা ঃ ২০৮)

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মানুষ যে ব্যাপারেই ইসলামের নির্দেশ মেনে চলেনা, তাতে সে শয়তানেরই আদেশ মানে। উপরোক্ত নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এ কথাও বলে দিয়েছেন ঃ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ–

অর্থাৎ ঃ "ফয়সালা করা ও নির্দেশ জারী করার সকল ক্ষমতা শুধু আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এখন মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালাকেও মন্দিরের মূর্তির ন্যায় চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখতে বদ্ধপরিকর। তাঁকে শুধু পূজা করার সময় একটা সিজদা করে দিলেই চলবে। জীবনের বাদবাকী কর্মকান্ডে তাঁর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা। বড় জোর তাদের নিজেদের বানানো শাসক আল্লাহকে যতোটুকু ক্ষমতা সেচ্ছায় দিতে সম্মত হয়, ততোটুকুর আওতায় আল্লাহর হুকুমও মানা যাবে। কিন্তু তার বাইরে জীবনের আর সকল কর্মকান্ড আল্লাহর শরীয়ত নয়, রবং আল্লাহ থেকে বেপরোয়া ও আল্লাহবিমুখ জীবন পদ্ধতি অনুসারেই চলবে।

এই চিন্তাধারার অধিকারী মুসলমানদের মধ্যে একটি শ্রেণী এমনও আছে, যারা আল্লাহর পূর্ণাংগ ও শর্তহীন আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁর সাথে দরকষাকষি করে। তারা কোন্ কোন্ ব্যাপারে কতোটা আনুগত্য করবে, সে ব্যাপারে ফায়সালা করার এখতিয়ারও নিজেদের মুঠোর মধ্যে রেখে দেয়। ফলে কোথাও لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا– "আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেননা।"[৩] এই আয়াতের ওজুহাতে জান ও মালের সামান্য ক্ষতি হয় এমন জিনিসকেও নিজের ক্ষমতা বহির্ভূত গণ্য করে। এমনকি একটু অরুচিকর এবং জান মালের সামান্য ক্ষতিকর কাজকেও সাধ্যাতীত কাজ মনে করে। আবার কখনো وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَي التَّهْلُكَةِ– "নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা।"[৪] এই আয়াতের মনগড়া অর্থ গ্রহণ করে নিজেদের জন্য আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে পালানো এবং বাতিল ব্যবস্থার সাথে আপোষ করা ও তার পৃষ্ঠপোষকতা পর্যন্ত করার বৈধতা

৩. আল বাকারা ঃ ২৮৬।

৪. আল বাকারা ঃ ১৯৫।

প্রমাণ করতে চায়। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআনের এ আয়াতের কথাও ভুলে যায়, – يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে"[৫]- যাতে ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার যে স্বভাব কাফের ও মুশরেকদের ছিলো, তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা ভুলে গিয়ে এইসব মুসলমান নিজ দেশে আল্লাহর দীন কায়েমের যে আন্দোলন চলছে, তার প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার ও বাতিল শক্তির ভয়ে ভীত করার চেষ্টা চালায়। এমনকি এসব, খোদাভীতিহীন লোক গোটা কুরআনের দাওয়াতকে উপেক্ষা করে হযরত ইউসুফ আ. এর ওপর বাতিলপন্থী ও খোদাদ্রোহী সরকারের চাকরি করার অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর এই ছুঁতো দেখিয়ে প্রত্যেক বাতিলপন্থী শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রকার সেবা করাকে মুসলমানদের জন্য শুধু জায়েজই নয় বরং জরুরী বলেও অভিহিত করে থাকে।[৬] তারা ব্যভিচারের শাস্তি ও অন্যান্য ইসলামী দন্ডবিধির প্রয়োগ স্থগিত থাকার উদাহরণ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করার পক্ষে ওজুহাত খাড়া করে। তারা বলে, ইসলামী আন্দোলনের গৃহীত লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতিই যে ইসলামের লক্ষ্য ও কর্মপদ্বতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি যেমন অকাট্য সত্য ও ফরয হওয়া সত্ত্বেও কুফরীর আধিপত্য হেতু বর্তমানে কার্যোপযোগী নেই, তেমনি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ফরয, ওয়াজিব, সঠিক ও যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও আপাতত কার্যোপযোগী নেই। অথচ "আল্লাহ কোনো অসাধ্য কাজের দায়িত্ব কারো ওপর চাপাননা।" এ আয়াতে যে অসাধ্য কাজের কথা বলা হয়েছে সেটা নির্ণয় করার এখতিয়ার তাদের নয়, আল্লাহর। কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরই জীবন থেকে এক একটা ঘটনা তুলে ধরে তাদের বলবেন, তোমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য চেষ্টা তৎপরতা চালানোর যাবতীয় ক্ষমতাইতো তোমাদের ছিলো, কেবল আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনার বেলায়ই এই সমস্ত ওজর বাহানা তোমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতো এবং এখানে এসেই তোমাদের কাছে সব কাজ অসাধ্য ও অসম্ভব মনে হতো। তাছাড়া "আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননা" এবং "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করোনা" এই কুরআনী উক্তিদ্বয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তা তাদের সামনে তায়েফের অলিগলিতে

---

৫. সূরা হুদ ঃ ১৯।

৬. উল্লেখ্য যে, আলোচ্য নিবন্ধটি যখন লেখা হয়, তখন বিভিন্ন বড় বড় আলেমের পক্ষ থেকে খুবই জোর দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই যুক্তি পেশ করা হচ্ছিলো।

ও বদর-হুনাইনের রণাঙ্গনে রক্তের অক্ষরে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান।[৭] আর হযরত ইউসুফ আ. এর ওপর খোদাদ্রোহী শক্তির চাকরি করার যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, তার জবাব সূরা নিসার নিম্নোক্ত (৬৪) আয়াতেই রয়েছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

"(হে মুহাম্মদ! তুমি ওদের জানিয়ে দাও যে) আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি, শুধু এজন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে।"[৮] এই মূলনীতি দ্বারা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীর জন্যই আল্লাহর নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য। নবী অন্যের আনুগত্য ও চাকরি করবেন তার তো প্রশ্নই ওঠেনা। আর আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত হাজার হাজার নবী হরেক রকমের পরিস্থিতি ও পরিবেশে কাজ করে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, সব ধরনের বাতিল ব্যবস্থার আওতায় জীবন ধারণ করেও সেখানে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা যায় এবং এর কর্মপদ্ধতিও সকল যুগে ও সকল পরিস্থিতিতে কার্যোপযোগী। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এইসকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যখন নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং পদমর্যাদা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন, তখন কোনো 'অক্ষমতা' তাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেনা, 'ধ্বংসের' কোনো আশংকাও তাদেরকে বাধা দেয়না এবং পবিত্র কুরআনের কোনো হুকুম লংঘিত হয় বলেও তাদের মনে হয়না। কেবল আল্লাহর দীন কায়েম করার সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানালেই আল্লাহর কালামের এসব ব্যাখ্যা তাদের মাথায় ভিড় জমায়। আসলে এসব ব্যাখ্যা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান থেকে জনগণকে বিরত রাখার জন্য প্ররোচনা মাত্র। আর

---

৭. "আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতাবহির্ভূত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননা" এই বক্তব্যটি মুজাহিদ আন্দোলনের মহানায়ক শাহ ইসমাঈল শহীদের সামনেও পেশ করা হয়েছিলো।। তিনি প্রচন্ড গ্রীষ্মের দিন দুপুর বেলায় মসজিদের উত্তপ্ত বারান্দায় খালি পায় ও খালি মাথায় হেটে বেড়াচ্ছিলেন। তা দেখে একজন বললো, হুজুর আল্লাহ তো বলেছেন, তিনি কাউকে তার ক্ষমতাবহির্ভূত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেননা। সুতরাং আপনি নিজেকে অনর্থক এতো কষ্ট দিচ্ছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, আমিও দেখছি, আমার প্রতিপালক আমার মধ্যে কতোখানি সহনক্ষমতা দিয়েছেন। নিজের সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করে আল্লাহর পথে নিজের সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ না করেই যদি বসে থাকি তাহলে তো আখিরাতে ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্য রসূল পাঠানো হয়না যে, তিনি অন্যদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করবেন ও অন্যদেরকে করতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং রসূলের আগমনের উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, যে আইন ও বিধান তিনি নিয়ে আসবেন, তা তিনি নিজেও মেনে চলবেন আর তার অনুসারীরাও অন্য সকল আইন ও বিধিব্যবস্থাকে বর্জন করে শুধু এই আইনকেই অনুসরণ করবে।

সূরা 'নাসে' এ ধরনের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

"এ বলে দোয়া করো ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, যিনি মানব জাতির স্রষ্টা, প্রতিপালক, শাসক, সম্রাট ও উপাস্য- মানুষের মনে লুকিয়ে লুকিয়ে কু-প্ররোচনাদানকারী শয়তান থেকে-চাই সে মানুষ শয়তান হোক বা জ্বিন শয়তান হোক।"

আমি সকল মুসলমান ভাইকে, বিশেষত যাঁরা আল্লাহর দীনকে কায়েম ও বিজয়ী করার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে আহ্বান জানাই, আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার যে অংগীকার কলেমায় শাহাদাত উচ্চারণের মাধ্যমে করেছেন, সেই অংগীকার আপনারা প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্মরণ রাখুন এবং নিজের গোটা জীবন ও যাবতীয় কর্মকান্ডকে এই অংগীকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলুন। এমনকি আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত কোনো শব্দ, মস্তিষ্কে উদ্ভূত কোনো একটি ধারণা, আমাদের হাত পা ও অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ থেকে সংঘটিত কোনো একটি কাজ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত কোনো একটা আচরণও যেনো এই অংগীকারের বিরোধী না হয়। বরঞ্চ আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ও তৎপরতা যেনো ইতিবাচকভাবে কেবল আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনবিধানের বাস্তব নমুনা ও প্রতিফলন হয় এবং আমাদের সমগ্র জীবন ও তার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ যেনো ইসলামী শরীয়তের রশি দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের খুঁটির সাথে বাঁধা একত্ববাদী আকীদা বিশ্বাসের চারদিকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত থাকে যেনো দুনিয়াবাসী আমাদের জীবনকে আল্লাহর وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ- "আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব করবে, অর্থাৎ আমার নির্ধারিত জীবন পদ্ধতি থেকে একচুল পরিমাণও এদিক ওদিক সরবেনা" এই আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পায়। একেই বলে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা ও সত্যিকার আল্লাহর আনুগত্য। এরই নাম তাকওয়া ও পরহেজগারী এবং এরই নির্দেশ নিম্নের আয়াতটিতে দেয়া হয়েছে ঃ

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-

"তাদেরকে শুধু এই আদেশই দেয়া হয়েছিলো যে, তারা যেনো কেবল আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নিজেদের আনুগত্যকে কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় একেবারে নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠভাবে।" (বাইয়্যেনা ঃ ৫) এ ছাড়া আর কোনো

৫—

ধরনের আচরণ মুসলমানের জন্য শোভনীয়ও নয়, বৈধও নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। কেননা ইসলাম শব্দের অর্থই হলো, কোনো রকম ওযর আপত্তি ছাড়াই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের সামনে সর্বতোভাবে নতি স্বীকার করা।

কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী, তাওহীদ বিশ্বাসের দ্ব্যর্থহীন দাবিসমূহ এবং নবীদের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহকে উপেক্ষা করে কেউ যদি ধারণা করে যে, কেবল চিল্লার পর চিল্লা দিলে, মুরাকাবায় তথা আধ্যাত্মিক ধ্যান গবেষণায় নিয়োজিত থাকলে, ওয়ায ও মিলাদের অনুষ্ঠানাদি করলে, সমাজ-সংস্কারের কাজ করলে কিংবা মাদ্রাসা বা এতীমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করলেই ইসলামের খিদমতের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর মুমিন ও মুসলমান বান্দা হিসেবে মুসলমানদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, তাহলে সেটা হবে তার মস্তবড় ভুল ধারণা।[৯] একথা বুঝার জন্য সাধারণ বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট যে, কোটি কোটি মুসলমান বেঁচে থাকতে যদি আল্লাহর দীন পরাজিত থাকে, সমগ্র পৃথিবী যদি দাংগা হাংগামা ও নৈরাজ্যের শিকার হয়, সর্বত্র যদি অত্যাচার ও অনাচার চলতে থাকে এবং আল্লাহর পতাকা ভূলুণ্ঠিত আর খোদাদ্রোহীদের পতাকা উত্তোলিত থাকে, তবে সেখানে এই খোদাদ্রোহীতার পরিবেশকে আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর পরিবেশে রূপান্তরিত করার জন্য প্রাণপণ জিহাদ ও লড়াই করা ছাড়া অন্য কোনোভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

ইসলামের এই মৌলিক ধারণাকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যাতে করে ইসলামের মূলতত্ত্ব ও তাওহীদ বিশ্বাসের দাবিসমূহ প্রতিদিন কয়েকবার মুমিন বান্দার সামনে আসতে থাকে। উপরন্তু তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করার অংগীকারও যেনো প্রতিদিন অন্তত ৩২ বার তাদের কাছ থেকে হাতজোড় করিয়ে আদায় করা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, জীবনের অন্যান্য ব্যস্ততার কবলে পড়ে সে যেনো উদাসীন হয়ে না যায়। আপন প্রতিপালকের দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে যেনো সে বিমুখ ও বিচ্যুত হওয়ার পক্ষে কোনো ওযর আপত্তি বা বাহানা

---

৯. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ-

"হাজীদের পানি খাওয়ানো এবং কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধানের কাজকে কি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য মনে করেছ?" আল্লাহর কাছে এ দুই ধরনের কাজ সমান নয়।" (আত-তাওবা ঃ ১৯)

পেশ করার কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ সহকারে সত্যকে তুলে ধরার ব্যাপারে কোনো অসম্পূর্ণতা রয়েছে বলে অভিযোগ করার কোনো অবকাশ না পায় বরং যেদিন সে হিসাব নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, সেদিন অপরাধ যেনো স্বীকার করে নেয়া ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর না থাকে সম্ভবত কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এই দৃশ্যই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا. قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ-

"হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকেই রসূলগণ আসেনি যারা তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী জানাতো এবং আমার সাথে আজকের সাক্ষাতকার সম্পর্কে সতর্ক করতো? জ্বিন ও মানুষেরা জবাব দেবে, হাঁ, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আজ দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করছে, অথচ সেদিন তারা স্বয়ং নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, (আল্লাহর হুকুম ও রসূলের শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও) তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।" (সূরা আল আন'আম ঃ ১৩০)

সালাতের সত্যিকার উদ্দেশ্য

আসুন এখনো সময় আছে, আমরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে দেখবো এবং প্রতিদিন নামাযে পাঁচবার আল্লাহর সাথে যে অংগীকার আমরা করে থাকি, তা কতোখানি পূরণ করছি, তা খতিয়ে দেখবো। আমাদের জীবনের বাস্তব সাক্ষ্য এ ব্যাপারে কি? আল্লাহর আনুগত্যের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তো দূরের কথা, আমরা তাঁর দাসত্বের কোনো দাবিই কি পূরণ করতে পারছি, পারলে তা কতোখানি, নামাযের বাস্তব উদ্দেশ্য এই পর্যালোচনার দিকেই বারবার মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে।

সালাতের প্রথম বাক্য

এবার দেখুন, নামাযের জন্য দাঁড়ানো মাত্রই সর্ব প্রথম যে বাক্যটি আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

"আমি সুনিশ্চিতভাবে অন্য সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, অন্য সকলের সাথে

সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আনুগত্য ও নতি স্বীকারের সকল কেন্দ্রকে বর্জন করে পূর্ণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা সহকারে কেবল মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (এক আল্লাহর) সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলাম আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

নামাযের জন্য দাঁড়ানো মাত্রই এই ঘোষণা উচ্চারণ করানো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাতো দূরের কথা, তাঁর সামনে হাজির হতে হলেও মানুষের আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতি ভক্তি, আসক্তি ও আনুগত্য পরিহার করে একেবারে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। নিজেকে আপাদমস্তক শর্তহীনভাবে তাঁর দাসত্বে ও আনুগত্যে সোপর্দ করে দিতে হবে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের খতিয়ে দেখতে হবে যে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক বাস্তবিক পক্ষেই এরকম কিনা? আমরা আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর অধিকারে এবং তাঁর ক্ষমতায় আর কাউকে শরীক করছি না তো? আমাদের এই পয়লা পদক্ষেপও যদি সঠিক না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা এমন একটা ইমারত নির্মাণের প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি, যার কোনো ভিত্তিই নেই। এমতাবস্থায় এই শ্রম দ্বারা দৈহিক শান্তি ও অবসাদ ছাড়া আর কি অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়? তাই তো আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ–

"যে নামাযীরা নামায সম্পর্কে উদাসীন, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।" বস্তুত এ কারণেই দেখা যায়, অনেকে নামায পড়ে বটে, তবে তা তাদের স্বভাব চরিত্র ও আচার আচরণে নামায কোনো প্রভাব বিস্তার করেনা।

তাকবীরে তাহরীমা

লোকেরা তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযে প্রবেশ করে থাকে। এই জিনিসটির এতো গুরুত্ব যে, এটি না পড়লে তার নামাযে প্রবেশ করাই হয়না এবং নামাযের রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো, বসা, দরুদ, তাসবীহ সবকিছু সুসম্পন্ন হলেও নামায হয়না। চিন্তা ও কর্মের বিশুদ্ধতার জন্য এই ঘোষণার গুরুত্ব এতো বেশী যে প্রতিদিন কমপক্ষে একশো আটাত্তর বার এ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করানো হয়। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং বলুন যে, আপানি কি নিজের জীবনে এবং কর্মকান্ডে আল্লাহকে সত্যিই সবচেয়ে বড় বলে বিশ্বাস করে থাকেন এবং সকল কাজে তাঁর মর্জী ও পছন্দকে অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন? যদি আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি ও ঘোষণা বারবার দেয়া সত্ত্বে বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব না করে তাঁর বিদ্রোহী ও অবাধ্য লোকদের অথবা নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য ও

দাসত্ব করা হয়, তাহলে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতিকে কিভাবে সত্য মনে করা যেতে পারে?

'আল্লাহু আকবার' ("আল্লাহ সবচেয়ে বড়") এই সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে যে মানুষ নামাযে প্রবেশই করতে পারে না, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বড়ত্বের ধারণাকে অন্তরে লালনকারী আল্লাহর দরবারে পদার্পণেরই যোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য হওয়াতো দূরের কথা।

সানা পাঠ

তাকবীরে তাহরীমার পর একজন নামাযী নিম্নোক্ত বাক্য পাঠ করে আল্লাহর সানা বা প্রশংসা করে থাকে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ-

"হে আল্লাহ! তুমি সকল দুর্বলতা ও দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, তুমি সকল সৎগুণের অধিকারী। তোমার নাম সবচেয়ে বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা সবচেয়ে উচ্চ। তুমি ছাড়া কোনো হুকুম কর্তা নেই।"

এক্ষণে নিজের মনমগজ এবং চিন্তা ও কর্মের ওপর একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিন এবং নিজেই বুঝতে চেষ্টা করুন যে,

১. এই ঘোষণাগুলো অনুযায়ী আপনি কি বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহর প্রতি সর্বাবস্থায় তুষ্ট, তাঁর সকল ফায়সালায় সন্তুষ্ট এবং জীবনের সকল চড়াই উৎরাইয়ে তাঁর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে বহাল আছেন? জীবনে যখন যে অবস্থাই আসুক, মুখে কোনো অভিযোগ অনুযোগ উচ্চারণ না করে আল্লাহ তায়ালাকে যথার্থই 'সর্বদোষমুক্ত' মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকেন?[১০] যদি তা না হয়ে থাকে, তবে নিজের মধ্যে এই অবস্থাটা সৃষ্টির চেষ্টা করুন।

২. আল্লাহকে সকল প্রশংসা ও সৎগুণের আধার বলে বারংবার স্বীকৃতি দেয়ার ফলে আপনার মনমগজের অবস্থা এরূপ হয়েছে কি যে, এখন যেখানেই কোনো নয়নাভিরাম রূপ, মনোমুগ্ধকর গুণ, শক্তি, প্রতাপ, যোগ্যতা, দক্ষতা,

১০. সূরা আহযাবের ১২নং আয়াতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "যখন মুমিনরা আক্রমণকারী বাহিনীকে দেখলো তখন বলে উঠলো যে, এইতো সেই ঘটনা, যা ঘটবে বলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছিলেন। এ ঘটনা তাদের ঈমানকে ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"

কিংবা অন্য কোনো চমকপ্রদ জিনিস দেখতে পান, তার বাহ্যিক চমৎকারিত্বে অভিভূত হয়ে তার সামনে সিজদায় নত হওয়ার পরিবর্তে কেবল এই সবকিছুর স্রষ্টা ও দাতা মহান আল্লাহর সামনেই কৃতজ্ঞতার সাথে আপনার মাথা নত হয়ে যায়? এই স্বীকৃতির পরও যদি কারো মাথা স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির সামনে নুয়ে পড়ে, তাহলে তার এই কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে আসলে আন্তরিকভাবে উক্ত স্বীকৃতি দেয়নি।

৩. "তোমার নাম সবচেয়ে বরকতপূর্ণ" এই মর্মে স্বীকৃতি দেয়ার পর আপনি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধাভাজনের কাছ থেকে বরকত তথা মংগল কামনা ও প্রার্থনা করা কিংবা তাদেরকে মংগলের উৎস মনে করা থেকে বিরত আছেন? একমাত্র আল্লাহকেই বরকত ও মংগলের একক উৎস মনে করছেন? সকল বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য কি তাঁর কাছেই ধর্না দিচ্ছেন? আপনার কথার সাথে যদি আপনার কাজের মিল না থেকে থাকে, তাহলে এই মিথ্যা চাটুকারিতা দ্বারা সেই বিশ্বপ্রতিপালককে কতোটুকু প্রভাবিত করা যাবে, যিনি অন্তর্যামী এবং গোপন প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত?

৪. "তোমার মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু" এই মর্মে প্রতিনিয়ত স্বীকৃতি দেয়ার পর আপনি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল প্রভুত্বের দাবিদার থেকে এতোটা নির্ভীক, বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী হতে পেরেছেন যে, এখন আর কারো প্রতাপ ও বিক্রম, জাঁকঝমক ও আড়ম্বর, শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী এবং শানশওকত আপনার চোখকে ধাঁধায়না, মনকে ভীত সন্ত্রস্ত করেনা এবং মস্তিষ্ককে ভড়কে দেয়না? পক্ষান্তরে এ দ্বারা কি আপনি এতোটা সাহসী ও উদ্যমী হতে পেরেছেন যে, সত্য ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে এবং নিজ অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে কোনো বিরোধী শক্তিকে আপনি তোয়াক্কা তো করেনইনা, উপরন্তু নিজের দৃঢ়তা, তেজস্বীতা ও অনমনীয়তা দ্বারা অন্যদেরকেই ভীত সন্ত্রস্ত ও পরাজিত করে দ্বিধাহীন চিত্তে এই ভেবে সামনে এগিয়ে যান যে, আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সবার চেয়ে বড় ও সবার চেয়ে পরাক্রান্ত?

৫. 'তুমি ছাড় কোনো হুকুমকর্তা নেই" আপনার স্বীকৃতিই ইসলামের প্রাণ এবং এই বিশ্ব প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ও অকাট্য সত্য। এই সত্যকে আপনি প্রতিদিন প্রতি নামাযের প্রথম রাকাতে নিরন্তর স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে আপনি নিজের জীবন ও নিজের পছন্দ-অপছন্দের জিনিসগুলোকে যাচাই করে দেখুন, তা কতোদূর এই স্বীকৃতির অনুসারী

এবং এর যথার্থ প্রতিফলন? আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে নিজেই স্বীকার করবেন যে, বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অবস্থা এটা নয়, বরঞ্চ আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন খোদার হাতে দিয়ে রেখেছি। আমরা বলি একরকম, আর করি অন্যরকম। আমরা কলেমা পড়ি আল্লাহ ও রসূলের, কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের হুকুম ও আইনকে জীবনের আইনে পরিণত করতে প্রস্তুত নই। অথচ রসূল সা. মুমিনসুলভ জীবনের উদাহরণ দিয়েছেন এমন একটি ঘোড়া দ্বারা, যাকে একটা রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে যতো লাফঝাঁপই করুক, তা ঐ সীমার মধ্যেই সীমিত থাকবে, যতোদূর তার গলার রশি তাকে যতে দেয়। এই রশি হচ্ছে শরীয়ত তথা ইসলামী আইন ও বিধানের রশি আর এই খুঁটি হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের খুঁটি।[১১]

আউযু বিল্লাহ

এবার আসুন। আউযু বিল্লাহ-- প্রসংগে। আমরা নামাযে কমপক্ষে ১১ বার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– পড়ার মাধ্যমে শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। কিন্তু এই দোয়া বারবার করা সত্ত্বেও এর দাবি অনুসারে আমরা কি আমাদের জীবনকে শয়তানের অনুসরণ ও আল্লাহর নাফরমানী থেকে পবিত্র করার কোনো বাস্তব চেষ্টা চালাচ্ছি? যে কৃষক জমিতে চাষও দেয়না, বীজও বপন করেনা, অথচ কেবলই দোয়া করতে থাকে যে, হে আল্লাহ আমার জমিতে অনেক ফসল দাও, আমাদের অবস্থা কি সেই কৃষকের মতো নয়?

একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, মানুষ যে কাজটি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অন্য কোনো নিয়মবিধি অনুসরণ করে সম্পন্ন করে, সে কাজে সে শয়তানেরই ক্রীড়নক ও হাতিয়ার হয়ে থাকে। কেননা সে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর রীতি পৃথিবীতে চালু করা ও সমাজে তা বিস্তার ঘটানোর সহায়ক ও মাধ্যম হয়ে থাকে। হাদীসে আছে, যতোদিন কোনো মানুষের সৎ কিংবা অসৎ কাজের প্রভাব দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবে এবং দেখা দিতে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত তার আমলনামায় তার সেই সৎকাজ বা অসৎ কাজ লেখা হতে থাকবে। এমনকি পৃথিবীতে যে কোনো হত্যাকান্ড সংঘটিত হোক, তার গুনাহ আদম আ. এর

---

১১. রসূল সা. বলেছেন ঃ
"মুমিন ও তার ঈমানের উদাহরণ একটি খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়ার মতো। সে যতোই ঘোরাফেরা করুক। তার রশির আওতার মধ্যেই থাকে।"

সেই ছেলেটির আমলনামায়ও লিপিবদ্ধ হতে থাকে, যে প্রথম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলো।

সূরা ফাতিহা

সানা ও আউযুবিল্লাহ পড়ার পর বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়। সূরা ফাতিহা হলো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ- (اٰمِيْن)

"সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের স্রষ্টা প্রতিপালক, মালিক, শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক, যিনি দয়াময় ও করুণাময়, যিনি কর্মফল দিবসের সর্বময় কর্তা। হে আল্লাহ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছ থেকেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো তাদের পথ। যারা অভিশপ্ত ও বিপথগামী, তাদের পথ নয়। (আমাদের দোয়া কবুল করো।)

এখন এই সূরার এক একটি আয়াত দ্বারা প্রতিদিন কমপক্ষে ৩২ বার যে অংগীকার করা হয়, তার আলোকে নিজের জীবন ও আচরণ পদ্ধতি পর্যালোচনা করুন এবং দেখুন, আপনি এই অংগীকার কতোখানি পালন করছেন?

১ "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য" এই কথাটা দ্বারা আপনি ঘোষণা করছেন যে, সর্বপ্রকারের প্রশংসা বা গুণকীর্তন, কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য আর কারো নয়। কেননা সমগ্র বিশ্বজাহান ও তার প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা তিনিই। যে সৃষ্টির মধ্যে যে সৌন্দর্য বা সৎগুণ নিহিত আছে, আল্লাহই তা দিয়েছেন। তাই এই ঘোষণার স্বাভাবিক দাবি ও ফলশ্রুতি হলো, প্রত্যেক রূপ ও গুণের প্রকাশ আপনার মাথাকে যেনো আগের চেয়েও বেশী ভক্তিশ্রদ্ধা ও আনুগত্য সহকারে মহান স্রষ্টার সামনে নত করে দেয় এবং আপনাকে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীতে আরো বেশী দক্ষ ও পরিপক্ক করে দেয়। নচেত বারংবার একথা উচ্চারণ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

২ আলহামদুলিল্লাহর পর আমরা দ্বিতীয় যে জিনিসটা ঘোষণা করি তা হচ্ছে, আল্লাহ হচ্ছেন রব্বুল আলামীন বা সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে সর্বজগতের প্রতিপালক বলে যে ঘোষণা ও স্বীকৃতি দেয়া হলো, তা কি আমাদের মনমগজে একটা জীবন্ত আকীদা বিশ্বাসের আকারে বদ্ধমূল

হয়েছে? এই আকীদা কি যথার্থই আমাদের প্রতিটি কাজ, কথা, সম্পর্ক ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণকারী পথনির্দেশক মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে? আমরা কি এতোটা দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় হতে পেরেছি যে, কোনো ভয়ভীতি বা প্রলোভন দ্বারাই আমাদেরকে সত্যের পথ থেকে হটানো যায়না? আমরা কি সূরা হা-মীম সাজদায় যে বীর মুজাহিদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ আমাদের রব- এই ঘোষণা দিয়ে অবিচল থাকে" তাদের মতো আল্লাহকেই একমাত্র রব মেনে নিয়ে দুর্জ্জয় শপথে উজ্জীবিত হতে পেরেছি? আল্লাহই যখন সারা বিশ্বের প্রতিপালক এবং আমাদের সকলের মনিব, জীবিকার সমস্ত উৎস যখন তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, তিনিই যখন সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই লালন পালন করছেন এবং তিনিই লাভ লোকসানের মালিক, তখন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পাবো কেন? অন্য কারো আনুগত্য ও গোলামী কেন করবো?

أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ-

"আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের মনিব ও অভিভাবক বানাবো? অথচ তিনিই সবাইকে আহার করান এবং তাঁকে কেউ আহার করায়না।" (আল-আনয়াম ঃ ১৪)

قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِىْ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ-

"বল, আমি কি তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো প্রভুকে খুঁজবো? অথচ তিনিই তো সকল জিনিসের প্রভু প্রতিপালক।" (আল-আনয়াম ঃ ১৬৫)

أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ-

"যারা আদৌ কোনো জিনিস সৃষ্টি করতে পারেনা বরং নিজেরাই সৃজিত এবং যারা নিজেদের পূজারীদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা, তাদেরকেই কি ওরা আল্লাহর সাথে শরীক বানায়?" (আল্ -আরাফ ঃ ১৯১-১৯২)

এখন একথা বলারই অপেক্ষা রাখেনা যে, সর্ব জগতের প্রতিপালক ও মনিব মহান আল্লাহ ছাড়া আর যে-ই নিজের প্রভূত্ব, নিজের খোদায়ী নিজের সার্বভৌমত্ব ও নিজের মনিবত্বের দাবিদার হোক না কেন এবং মানবজাতি আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই নিজেদের খোদা ও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করুক না কেন, তারা সবাই নিজেদের বান্দা বা প্রজাদেরকে জীবিকা দেয়ার পরিবর্তে তারাই তাদের কাছ থেকে নিজেদের জীবিকা গ্রহণ করে থাকে। কোনো রাজা বা শাসক-চাই সে

ফেরাউন ও নমরুদের মতো প্রতাপ, পরাক্রম, জাঁকজমক ও শান শওকতের অধিকারী হোক না কেন, তার প্রজারা কর-খাজনা ও নজরানা ইত্যাদি দিয়ে তার কোষাগার ভর্তি না করলে এবং প্রয়োজনে তার সৈন্যসামন্ত সেজে তাকে তার শত্রু থেকে রক্ষা না করলে সে নিজের খোদায়ী ও রাজত্বের জাঁকজমক প্রতিষ্ঠিত করতেই পারেনা। কোনো কবরে শায়িত ব্যক্তি পূজনীয় ও উপাস্যে পরিণত হয় কেবল তখনই, যখন তার পূজারীরা স্বয়ং তার মাযার নির্মাণ করে নযর নিয়ায দিতে ও মান্নত শুরু করে। কোনো দেবদেবীর বেদী ততোক্ষণ সজ্জিত হতে পারেনা, যতোক্ষণ তার পূজারীরা তার মূর্তি তৈরী করে কোনো বিরাট মন্দিরে তা স্থাপন না করে এবং নানারকমের কিচ্ছা কাহিনী রচনা করে তা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচার না করে। এভাবে সমস্ত মনগড়া খোদা তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। আসলে একমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও প্রতিপালক। কেননা তাঁর খোদায়ী ও প্রভূত্ব একেবারেই স্বনির্ভর। তিনি কারো মুখাপেক্ষী তো ননই বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

৩ আল্লাহ তায়ালাকে রব্বুল আলামীন তথা সর্বজগতের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করার পর আমরা তাঁকে "রহমানুর রহীম" রূপেও স্বীকার করি। নিজ নিজ কাজ ও কথার ওপর দৃষ্টি দিয়ে বলুন তো যে, আল্লাহর রব্বুল আলামীন ও রহমানুর রহীম হওয়ার তাৎপর্য কি আমরা যথার্থই উপলব্ধি করেছি? আমরা কি অনুধাবন করেছি যে, আমাদের মনিবের দয়া, প্রতিপালন, স্নেহ, মমতা, বদান্যতা ও কৃপা করুণা কতো ব্যাপক, সর্বাত্মক, অফুরন্ত? তিনি কিরূপ নিখুঁত ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের ও এই নিখিল বিশ্বের অসংখ্য সৃষ্টির সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং ক্রমাগত করে চলেছেন? এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁর আনুগত্য করছে, না নাফরমানী করছে, নাকি তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করছে, সেটার কোনো তোয়াক্কা তিনি করেননা। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মকান্ড কি আমাদের এই অনুভূতির যথার্থ সাক্ষ্য দেয়? অমাদের জীবন যতোটা হওয়া উচিত ততোটা না হোক, মোটামুটিভাবে আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও তাঁর ফরমাবরদারীতে ব্যয়িত হচ্ছে কি? এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর দয়া ও করুণা, প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব যখন সর্বাত্মক ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা পরিব্যাপ্ত, তখন বান্দাদের আনুগত্য ও দাসত্ব কোনো বিশেষ জায়গা, ক্ষেত্র, সময় ও কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে আমাদের আচরণ ও সম্পর্ক সর্বাধিক দয়ালু আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই হওয়া উচিত। আমাদের জীবন আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি সর্ব প্রকারের যুলুম, নির্যাতন, বিদ্রোহ অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়া উচিত। কেননা সেই পরম দয়ালু আল্লাহর সীমাহীন দয়া ও করুণা

কখনো এটা করতে পারেনা যে, তাঁর কোনো সৃষ্টির ন্যূনতম অধিকারও কেউ খর্ব করবে এবং তাঁর যমীনের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি করবে। আর কেউ তা করলে আল্লাহর দয়া স্নেহ ও মমতার দাবি এইযে, তিনি সৃষ্টির ভেতরে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন এবং নির্যাতিতদের সুবিচারের জন্য নিরপেক্ষ বিচারের একটা দিন ধার্য করবেন, যেদিন প্রতিটি সৎকাজ ও অসৎ কাজের যথাযথ বদলা ব প্রতিদান দেয়া হবে। এটা শুধু তাঁর দয়ার দাবি নয় বরং বিবেকের সিদ্ধান্ত এবং নৈতিকতার দাবিও এইযে, ইবরাহীম ও নমরূদ, মূসা ও ফেরাউন, আবু বকর ও আবু জাহল এবং যালেম ও মযলূমের একই রকম কর্মফল হতে পারেনা।

৪ এই দাবির জবাবেই مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ– আয়াতটি দ্বারা আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সূরা হাশরের নিম্নের আয়াতে ঃ

لاَ يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ –

"জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী কখনো সমান হতে পারেনা।" অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِىْ الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ–

"আমি কি সৎকর্মশীল মুমিনদেরকে পৃথিবীতে তাদের মতো বানিয়ে দেব যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে ? আমি কি খোদাভীরু ও পাপীদেরকে সমান করে দেবো?" (সূরা সোয়াদ ঃ ২৮)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْاالسَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ–

"অসৎ কর্মশীল লোকেরা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে মুমিন ও সৎকর্মশীলদের ন্যায় বানিয়ে দেবো এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? কি জঘন্য সিদ্ধান্ত তাদের!" (সূরা আল জাসিয়া ঃ ২১)

বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো ঃ

لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا–

"প্রত্যেকে যেমন কাজ করবে, তেমন মর্যাদা পাবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১৩৩)

এ থেকে বুঝা গেলো, আল্লাহ তায়ালাকে বিচারের দিন তথা কর্মফল দিবসের সর্বময়কর্তা বলে ঘোষণা ও স্বীকৃতি দেয়ার পর আমাদের জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয়

সমস্ত কর্মকান্ড এই স্বীকৃতি ও আকীদা বিশ্বাস মোতাবেক সম্পন্ন হওয়া উচিত। কেননা একদিন আমাদেরকে প্রতিটি তৎপরতার ও প্রতিটি মুহূর্তের কনাকড়ি হিসাব সেই আল্লাহকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং যিনি অন্তর্যামী। এবার কর্মফল দিবসের তথা কিয়ামতের দিনের দৃশ্যকে আপন মানসপটে জাগরুক করে যাচাই করে দেখুন, আল্লাহর হক, পিতামাতার হক, ভাইবোনদের হক, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের হক, প্রতিবেশীর হক, সমাজের হক এবং আল্লাহর অন্যসকল সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার অবিকল আল্লাহ ও রসূল যেরূপ নির্ধারণ করেছেন সেভাবে ঠিক ঠিক মত দেয়া হচ্ছে কিনা? আপনার সকল কার্যকলাপ এরূপ আছে তো যে, বিচার দিবসের মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে পরম সৌভাগ্যশালীর মর্যাদা যদি নাও পান, তবে অন্তত তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে পারবেন?

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আপন সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার অধিকার অন্য সকলের অধিকারের চেয়ে বেশী। তাঁর অধিকার হলো, আমরা আমাদের সমগ্র জীবন শর্তহীনভাবে তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করবো, তাঁর বিধানকে বিজয়ী করবো ও পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিকে কার্যত চালু করার জন্য আমাদের যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দেবো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো সৃষ্টির কাছে প্রত্যক্ষভাবে কোনো অধিকার প্রাপ্য নেই। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং অন্যদের জন্য কিছু অধিকার আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কেননা তিনি তাদেরকে আমাদের জন্ম, লালন পালন এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। তাই তাদের অধিকারসমূহ প্রদান করা মূলত আল্লাহর হুকুম পালন করারই আওতাভুক্ত। তাই তারা যদি এমন কোনো জিনিসের আদেশ দেয়, যা আল্লাহর আইনের খেলাফ, তাহলে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে এরূপ আদেশ পালন করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ আদেশ পালন করলে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই যে দাবি আল্লাহর অধিকার বা তাঁর কোনো হুকুমের পরিপন্থী হয় তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে-চাই তা মা বাপের পক্ষ থেকে আসুক, পরিবারের পক্ষ থেকে আসুক অথবা অন্য কোনো পরাক্রান্ত শক্তির পক্ষ থেকে আসুক।

৫ --اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এই আয়াতটিতে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস দেই যে, আমাদের ইবাদত, দাসত্ব, আনুগত্য ও ফরমাবরদারী কেবল তোমারই জন্য। আমাদের যাবতীয় আশা ভরসার তুমিই সহায় ও নির্ভর। তোমার আনুগত্য ও গোলামী করতে গিয়ে আমরা যতো বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হই, সেগুলোতে আমরা তোমারই সাহায্য চাই। এই অংগীকারের আলোকে নিজেকে যাচাই করে দেখুন যে,

আমাদের দৈনন্দিন জীবন, চালচলন লেনদেন, আচরণ ও প্রাত্যহিক তৎপরতা থেকে কি এর বাস্তব প্রমাণ মেলে? তা যদি না পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে, আনুগত্য. দাসত্ব পুরোপুরিভাবে না হলেও বেশীর ভাগ অন্য কারো করা হচ্ছে, আর ঐ অন্যের আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে আল্লাহর। ভাবখানা হলো, আমরা তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেনো নিজের অসীম ক্ষমতাবলে আমাদেরকে তার বিরুদ্ধে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার আরো কিছু সুযোগ সুবিধা দান করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

৬ আপনি যখন প্রতিদিন বারবার "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও" বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, তখন আপনার মনে "সঠিক ও সরল পথে" চলার কোনো ইচ্ছা ও আকাংখা কি সত্যিই থাকে? আপনার বাস্তবজীবন ও তৎপরতায় কি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আপনি সঠিক ও সরল সত্যের পথ খুঁজছেন? আপনার শক্তি, যোগ্যতা, মেধা, চিন্তা, ধ্যানধারণা, জান, মাল ও সময়ের কোনো অংশ কি এর অনুসন্ধানে ব্যয়িত হচ্ছে? এ ব্যাপারে যেটুকু জ্ঞান আপনার আছে, তদনুসারে কি কোনো কাজ করে থাকেন? যদি তা না হয়ে থাকে বরং নিজের সকল উপায় উপকরণও ক্ষমতাকে 'সিরাতুন নাফ্স' তথা নিজের প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করার পথ সন্ধানের কাজে নিয়োজিত করে থাকেন, তবে "আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালাও" বলার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আল্লাহ যেনো তার সমস্ত নিয়মকানুন ও রীতিনীতি ভংগ করে, আপনাকে স্বাধীন নির্বাচনী ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি থেকে বঞ্চিত করে জড় পদার্থের ন্যায় একেবারেই অক্ষম ও অসহায় বানিয়ে জোরপূর্বক সত্য ও ন্যায়ের পথে ঠেলে দেন?

একথা ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যে, হক ও বাতিলের অনুসরণে বলপ্রয়োগ আল্লাহর বিধি নয়। তিনি বলেছেন "ইসলামে বলপ্রয়োগের অবকাশ নেই।" (আলবাকারা ঃ ২৫৬) কেননা তিনি মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তিনি পুরো স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য হিয়াদাত ও কল্যাণের পথ বেছে নেবে। নচেত গোমরাহী ও খোদাদ্রোহীতার পথ অবলম্বন করবে।

তবে সে যাই করুক। নিজের চেষ্টার ফল সে অবশ্যই পাবে।

আর যদি সে এ ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করে এবং এজন্য আঘাত খেতেও প্রস্তুত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য "সরল সঠিক পথ" উন্মুক্ত করে দেন।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে ইচ্ছুক এমন এক ব্যক্তি যদি রাজশাহীগামী ট্রেনে উঠে পড়ে, তবে সে চলার পথে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য যতো দোয়াই করুক, সিজদা করুক কিংবা মুরাকাবা করুক, শেষ পর্যন্ত সে রাজশাহীতেই পৌঁছে যাবে। পথিমধ্যে সে যদি দেশের ভৌগলিক তথ্য না জানার কারণে কোনো ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থেকে থাকে, তবে শেষ ষ্টেশনে পৌঁছে সে অবশ্যই বুঝতে

পারবে, সে গন্তব্য স্থানের পরিবর্তে অন্য জায়গায় এসে পড়েছে। এই ভুল সে যতো সরল মনে ও সদুদ্দেশ্যেই করুক না কেন, ফলাফলের কোনো হেরফের হবেনা। অথচ এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজমান। যে গাড়িতে আমরা চড়েছি, তা যে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী গাড়ি, তা জেনেও এবং মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েও তাতে শুধু চড়ে বসিনি বরং তাকে কঠোর পরিশ্রম করে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা দিয়ে চলেছি। আর সাথে সাথে "আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালাও" এই কথাটাও জপ করে চলেছি। এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? সত্যিই যদি সঠিক পথে চলার ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে এই গাড়ি থেকে নেমে যান, এ গাড়ি চালানোর পরিবর্তে একে চেইন টেনে, ব্রেক কষে থামানোর চিন্তা করুন এবং এর চালককে সোজা পথের দিকে ডাকুন। আর যদি চালক ডাকে সাড়া না দেয়, তবে অন্যান্য আরোহীদের জানিয়ে দিন যে, গাড়ি ভুল পথে চলছে, অতঃপর তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গাড়িকে সঠিক পথে ঘোরানোর ও চালানোর ব্যবস্থা করুন। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে যে কয়জন আরোহীকে সাথে নিতে পারেন নিন এবং গাড়ি থেকে নেমে যান। এতে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছা না গেলেও তা থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার আশংকা থাকবেনা।[১২] এরপর আল্লাহর কাছে সঠিক পথের সন্ধান ও সঠিক পথে চলার শক্তি চাইলে ইনশাআল্লাহ তিনি সেই সঠিক পথ দেখিয়েও দেবেন এবং সেই পথে চলার তাওফীকও দেবেন।

৭ "যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছো তাদের পথ। যারা অভিশপ্ত ও বিপথগামী হয়েছে তাদের পথ নয়।" এ আয়াত এ কথার ব্যাখ্যা করছে যে, "সিরাতুল মুসতাকীম" তথা সরল সঠিক পথ বলতে আমরা কি বুঝি? এই প্রার্থনার স্বতস্ফূর্ত দাবি হলো, মানুষ "অভিশপ্ত" ও "বিপথগামী" লোকদের পথ বাস্তবিকভাবেই ছেড়ে দেবে, অতঃপর যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যারা অভিশপ্ত ও বিপথগামী হয়নি তাদের পথে চলতে শুরু করবে। কিন্তু অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, মানুষ বাস্তবে আল্লাহর নাফরমানীর পথে চলতে থাকলো এবং হালাল হারামের কোনো তোয়াক্কাই করলোনা বরং ইসলামকে সেকেলে ও অচল আখ্যা দিলো এবং নিজের মনমগজ, হাত পা ও জানমালসহ সমস্ত শক্তি আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও চালু করার সংগ্রামে ব্যয় করার পরিবর্তে তাঁর নাফরমানদের হাতে সোপর্দ করে দিলো, তাহলে সূরা ফাতিহার এসব সকরুণ মিনতি সম্বলিত প্রার্থনা আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত আওড়াতে

---

১২. উল্লেখ্য যে, এ নিবন্ধ ভারত বিভাগের আগে লিখিত। এ সময় সারা ভারত ইংরেজদের শাসনাধীন ছিলো।

থাকা আল্লাহর সাথে তামাসা ও উপহাস করার পর্যায়ে পড়েনা কি? এর অর্থ তো দাঁড়ায় এইযে, হে আল্লাহ! তোমার যদি শক্তি থাকে, তবে আমাদেরকে বল প্রয়োগে তোমার নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে সরিয়ে দিয়ে তোমার প্রিয় ও অনুগ্রহভাজন লোকদের অনুসারী বানিয়ে দাও।

সূরা ইখলাস

সূরা ফাতিহার পর নামাযে কুরআনের অন্য যে কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করা হোক, তার আলোকে প্রত্যেক নামাযীর নিজের চালচলন ও কার্যকলাপ যাচাই করে দেখা উচিত যে, তা ঐসব আয়াত বা সূরার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা? যদি সামঞ্জস্যশীল না হয়ে থাকে এবং তার বিপরীত হয়ে থাকে, তাহলে তার ভাবা উচিত কিভাবে তাকে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা যায়? নচেত কিয়ামতের দিন তার পঠিত এই আয়াতগুলোই তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াবে।

যেহেতু সাধারণ মুসলমানরা বেশীর ভাগ সময় সালাতে সূরা ইখলাস পড়ে থাকেন, তাই এখানে এই সূরাটাই একটু বিশদভাবে আলোচনা করছি। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَد-

"(হে মুহাম্মদ!) বল ঃ আল্লাহ (যার দিকে তোমাদেরকে ডাকা হচ্ছে) এক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো পিতাও নন, ছেলেও নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা এই সূরায় ব্যক্ত করা হলো, তার প্রতি দৃষ্টি দিন এবং গভীর মনোযোগের সাথে নিজের জীবন ও কর্মকান্ড যাচাই করে দেখুন যে, তা এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সম্পর্কে যে আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে তার সাথে কতোটা সংগতিশীল? এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মনিব প্রভু নেই যে, তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে তোমরা অন্য কোনো মনিবের কাছে আশ্রয় নেবে। তিনি কোনো কিছুর জন্য তোমাদের বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন যে, বাধ্য হয়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বা নতি স্বীকার করবেন। তাঁর কোনো ছেলে নেই যে, তার আবদার রক্ষা করতে তিনি বাধ্য হবেন। তাঁর কোনো পিতাও নেই যে পিতৃসুলভ কর্তৃত্ব ফলিয়ে তাকে কোনো আদেশ পালনে বাধ্য করা হবে। তার সমকক্ষও কেউ নেই যে, তার মন রক্ষা বা তার প্রতি সৌজন্য রক্ষার্থে তিনি কোনো অবৈধ সুবিধা দিতে বাধ্য হবেন। কাজেই এ

ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই যে, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه-

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সেও দেখতে পাবে।"

রুকু, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং সিজদা

এরপর রুকুতে যাওয়া হয় এবং একাধিকবার "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" পাঠ করা হয়। তারপর "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ানো হয় এবং "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলে সিজদায় যাওয়া হয়। সিজদায় গিয়ে বারবার পড়া হয় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা।"

এখন প্রশ্ন হলো, "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" (যার অর্থ হলো, আমার মহামহিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু সকল দোষক্রটি থেকে মুক্ত) এই দুটি দোয়ায় যে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সে অনুসারে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের জীবিকা বন্টন ও তাকদীর সংক্রান্ত ফায়সালায় সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি? কোনো দুঃখকষ্টের সময় হতাশাগ্রস্ত হইনাতো? ইতিপূর্বে প্রাপ্ত সকল নিয়ামত ও সুখশান্তিকে ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিনা তো? অগাধ সম্পদ শক্তির অধিকারী হয়ে গর্বে ও অহংকারে আত্মহারা হয়ে যাইনাতো? যে অবস্থাই দেখা দিক না কেন আমরা সত্যের পথে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে টিকে থেকে সম্মুখে অগ্রসর হইতো? আমরা এই বিশ্বাস রাখিতো যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জীবন যাপনের যে উপকরণ যতোটুকু দেয়া ভালো মনে করেছেন দিয়েছেন, এখন এতেই আমাদের আমানতদারী, সততা, বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও যোগ্যতার পরীক্ষা? বস্তুতঃ রুকু ও সিজদায় প্রদত্ত এই স্বীকৃতির দাবি হলো, এরপর আমরা যেনো আমাদের এই মহিমান্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকে ছাড়া আর কাউকে আমাদের ভাগ্যে বা জীবিকায় কোনো হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন মনে না করি এবং আমাদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত প্রভুর বিধিনিষেধ লংঘন করে নিজের জীবিকা বৃদ্ধি করার কোনো চেষ্টার কল্পনাও না করি। কেননা আল্লাহর বন্টিত জীবিকায় ও নির্ধারিত ভাগ্যে কেউ এক চুল পরিমাণও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেনা।

এটাও বিচার বিবেচনার দাবি রাখে যে, রুকু থেকে মাথা তোলার সময় "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" ("আল্লাহ প্রত্যেক প্রশংসাকারীর প্রশংসা

শোনেন)" বলার মাধ্যমে আমরা যে স্বীকৃতি প্রদান করি, তার ফলে কি আমাদের যথার্থই এই জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে যে, আমাদের প্রকৃত ও একমাত্র প্রভু আল্লাহর সাথে অমাাদের সম্পর্ক একেবারেই ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। ফলে আমরা যখনই ইচ্ছা করি কোনো মাধ্যমে বা সুপারিশকারী ছাড়াই অবাধে তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলতে ও যাবতীয় আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারি। কেননা তাঁর দরবারে কোনো দ্বাররক্ষক কোনো প্রার্থীকে বাধা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনা।

আরো দেখার বিষয় হলো, রুকু থেকে উটে দাঁড়ানোর পর আমরা যে "রব্বানা লাকাল্ হামদ" (হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা) কথাটা বলি, তারপর বাস্তবিকই আমাদের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব ও প্রশংসার জন্য কোনো স্থান অবশিষ্ট থাকেনিতো? আল্লাহর সর্বব্যাপী প্রভুত্ব ও তত্ত্বাবধায়কত্বের পূর্ণ অনুভূতি আমাদের মনে জন্মে গেছেতো? কেননা "হামদ" বা প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট, যিনি মহামহিম ও শ্রেষ্ঠতম প্রভু।

তাশাহহুদ

এবার তাশাহহুদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। একজন নামাযী হাঁটু গেড়ে বসে আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত আরযি পেশ করে থাকে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

"আমাদের সমস্ত অভিবাদন, সমস্ত সালাত এবং আমাদের সকল পবিত্র জিনিস (আর্থিক দৈহিক ও মৌখিক ইবাদতসমূহ) আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। হে নবী। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ওপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আসুক এবং আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের ওপর শান্তি আসুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর দাস ও রসূল।"

নিজের এই স্বীকারোক্তির নিরীখে বলুনতো দেখি, আপনার বারংবার উচ্চারিত এই স্বীকারোক্তি কি বাস্তবিকপক্ষে সঠিক ও সত্য? সত্যই কি আপনার মুখ, জান, মাল ও যাবতীয় শক্তি আল্লাহর জন্য নিবেদিত? তা যদি না হয়ে থাকে, এমনকি আপনার সকল শক্তি না হলেও বেশ কিছু শক্তি যদি আল্লাহর জন্য না হয়ে কুফরীর বিজয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে খুশী করার

জন্য নিবেদিত হয়ে থাকে, তাহলে গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে ওয়াকিফহাল আল্লাহর কাছে বারবার এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি এবং তাঁকে ধোকা দেয়ার এই চেষ্টা দ্বারা কি লাভ হবে? এই ধরনের আচরণ অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালাকে কতো প্রচন্ডভাবে উস্কে দেবে ভাবুনতো? আর আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে এই আচরণ করে আমাদের নবী ও আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ সা.কে "হে নবী, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক' এই বলে সম্বোধন করা তাঁর পবিত্র আত্মার জন্য আনন্দদায়ক হবে না কি কষ্টদায়ক? এ ধরনের সালাম সেই ব্যক্তির সালামের মতো নয় কি, যে নিজের সকল শক্তি ও উপায় উপকরণ নিজের মনিবের বিরোধিতায় এবং তাঁর বিরোধীদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়োগ করে, কিন্তু মনিবের সামনে যখনই যায়, চরম ভন্ডামী ও কাপুরুষতার সাথে হাত জোড় করে বলতে থাকে, "হুজুর! অধম ভৃত্য আপনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। আমি তো আপনার মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভের জন্য সর্বক্ষণ দোয়া করি, আমার কাছে যা কিছু আছে তার সব তো আপনারই দান এবং আপনার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত?" এ ধরনের সালাম দিয়ে মনিবকে খুশী করা তো দূরে থাক এবং তার কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাওয়া তো দূরে থাক, তার মনে যে আঘাত লাগে, তা কি সহজে মোচনযোগ্য? এমতাবস্থায় আল্লাহর নবী ও সৎ বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক," এই দোয়া দ্বারা তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও দয়া ও করুণা জাগিয়ে তোলার আশা করা যায়না। এখানেই শেষ নয় বরং অনেক মুসলমানের অবস্থা এইযে, তারা যাদের জন্য মসজিদে বসে শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করে, মসজিদের বাইরে এসে তারাই আবার তাদের বংশ নিপাত করা এবং তাদের জান, মাল ও সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

তাশাহহুদের শেষভাগে "আশাহাদু আল্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়া হয় এবং তা প্রতিদিন বহুবার দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই সাক্ষ্য দেয়ার পর বাস্তবে কি হচ্ছে? সত্যই কি জীবনের কোনো দিক ও বিভাগে এবং কোনো কাজকর্মে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাস্য ও পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করা হয়না? এখন কি শুধু আল্লাহর নির্দেশাবলীই আপনি অনুসরণ করেন? তাঁরই হালাল কি আপনার জন্য হালাল, তাঁরই হারাম কি আপনার জন্য হারাম, তাঁরই আইন কি আপনার জন্য আইন, তাঁরই পছন্দ কি আপনার পছন্দ, তাঁরই খুশীতে কি আপনিও খুশী, তাঁরই রচিত জীবনপদ্ধতি কি আপনার জীবনপদ্ধতি, এমনকি তাঁর বন্ধু কি আপনার বন্ধু এবং তাঁর শত্রু কি আপনার শত্রুতে পরিণত হয়েছে? রক্ত ও প্রজাতিগত দিক থেকে কেউ আপনার ভাই, বাবা, ছেলে বা অন্য যে কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে

যায়না, আল্লাহর চোখে ভালো হলে তা আপনার চোখেও ভালো হওয়া চাই, আর আল্লাহর কাছে অপ্রিয় হলে তা আপনার কাছেও অপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে আরো প্রশ্ন জাগে, বারবার এই সাক্ষ্য দিতে দিতে আপনি কি বাস্তবিকই এতোটা আল্লাহভক্ত ও রসূলভক্ত হয়েছেন যে, আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য যে কোনো নেতৃত্বকে অস্বীকার করে জীবনের প্রত্যেক দিক, বিভাগ স্তর ও কাজকর্মে কার্যত একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব ও শিক্ষাকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন? এক্ষণে আপনার পুরো জীবনটা কি রসূলের শিক্ষা ও নেতৃত্বের অনুসরণে ব্যয়িত হচ্ছে? নাকি কেবল মুখে মুখে মুহাম্মদ সা. এর রিসালাত মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ কার্যত পারিভাষিক ইবাদতের বাহ্যিক রূপ ছাড়া জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সা. এর কোনোই কর্তৃত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

তাছাড়া রসূল সা. কে কি আপনি নিজের বিশ্বাসে ও কাজে বাস্তবিকপক্ষে ঠিক সেই পর্যায়ে রেখেছেন, যার ঘোষণা আপনি বারবার প্রত্যেক নামাযে করে থাকেন। অর্থাৎ আপনি রসূল (সা)কে নবূয়্যতের স্তরের নিচে নামিয়ে একজন সাধারণ দুনিয়াবী নেতা, সেনাপতি বা সংস্কারকের পর্যায়ে তো রাখেননি? কিংবা তাকে নবূয়্যতের স্তরের ওপরে উঠিয়ে স্বয়ং আল্লাহর সমকক্ষ তো বানিয়ে দেননি, যার কারণে সাধারণ মানুষ রসূলের বাস্তব অনুসারী হওয়াকে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন মনে করে? কেননা তারা ভাববে, কোথায় আমরা মাটির মানুষ আর কোথায় রসূলের মতো অতিমানব? খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখুন, আপনারা কি আপনাদের বিশ্বাসে ও কাজে বাস্তবিকপক্ষে রসূল সা. এর আল্লাহর রসূল হওয়া ও দাস হওয়ার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন?

দরূদ ও তার দাবি

তাশাহহুদের পর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করার আগে আমরা নিম্নোক্ত দরূদ পড়ে থাকি :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের ওপর রহমত করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহীম আ. ও তার অনুসারীদের রহম করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও মহিমান্বিত।"

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সা. ও অনুসারীদের বরকত দান করুন, যেমন ইবরাহীম আ. ও তাঁর অনুসারীদের বরকত দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও মহিমান্বিত।"

এই দরুদ ও সালামের আলোকে আপনি বলুন, যে রসূল ও তাঁর অনুসারীদের জন্য পর্যন্ত আপনি মুখ দিয়ে এতো ভালোবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন, রাতদিন তাদের জন্য সর্ববিধ কল্যাণ, বরকত, উন্নতি ও সমৃদ্ধির দোয়া করে, সেই রসূল যে মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন, তার সাফল্য ও বিজয়ের জন্য কি আপনি কোনো কাজ করছেন? এই দোয়া কি আপনি যথার্থ অন্তর দিয়ে করে থাকেন? আপনার দৈনন্দিন জীবন, তৎপরতা, চেষ্টা সাফল্য এবং আপনার জান ও মালের ব্যবহার কি সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য নিবেদিত? নাকি আপনার অবস্থা 'মুখে শেখ ফরিদ আর বোগলে ইঁট' সাদৃশ্য? একদিকে আপনার শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ আল্লাহর দীনকে দেশান্তরিত করা ও অনৈসলামিক ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার কাজে নিয়োজিত, আর অপরদিকে আপনার মুখে দোয়া দরুদের খই ফুটছে–এমন নয় তো? নিজে নিজে কথা কাজের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ পরখ করুন আর জনগণকেও এদিকে মনোযোগ দিতে বলুন। কেননা বিষয়টা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই খুবই বুঝে শুনে চলা দরকার। ভেবে দেখতে হবে যে, এ ধরনের দোমুখো ও পরস্পর বিরোধী স্বভাব চরিত্র নিয়ে যে দরুদ পাঠানো হবে তা রসূল সা. এর আত্মাকে আনন্দ দেবে, না কি কষ্ট দেবে? বাস্তব জীবনের কর্মতৎপরতার সাথে সামঞ্জস্যবিহীন কিছু দোয়া দরুদ বা তন্ত্রমন্ত্র জপলে ইটপাথর বা মাটির তৈরী দেবতারা খুশী হলেও হতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞ ও আলেমুল গায়েব আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নৈকট্য লাভ করা ও প্রিয় হওয়া এর দ্বারা সম্ভব নয়।

দোয়া কুনুত

সারা দিনের কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর লাভের পর রাতের নির্জন প্রহরে মহান আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আমরা বেতের নামাযে দোয়া কুনুতের মাধ্যমে প্রতিদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় যে অংগীকার করে থাকি, এখন তার আলোকেও নিজ নিজ চরিত্র ও কাজের পর্যালোচনা করুন এবং দেখুন, এই অংগীকারের আলোকে আপনার জীবন, তৎপরতা ও আচার আচরণের অবস্থা কি? বাস্তব কর্মকান্ডকে হিসাবের বাইরে রেখে নিছক কয়েকটি শব্দ "উচ্চারণ" করে দিয়েই অন্তর্যামী আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যাবে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অবশ্যই দূর হওয়া দরকার। তাই দোয়া কুনুতের প্রতিটি বাক্যের আলোকে নিজের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের বিচার পর্যালোচনা করুন এবং এই দোয়ায় কৃত

অংগীকারের ফলে নিজের ওপর যে দায়দায়িত্ব বর্তে, তা পালন করার কথা ভাবুন,

দোয়া কুনুত ও তার অনুবাদ হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ- وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ- اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য চাই, তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই, আমরা একনিষ্ঠভাবে তোমাকে আমাদের একমাত্র মনিব ও প্রভু বলে স্বীকার করি। তুমিই আমাদের সহায় ও ভরসা। আমরা তোমার সর্বোত্তম প্রশংসা করি। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং অকৃতজ্ঞ হইনা, (তোমার নাফরমানী করা তো দূরের কথা) তোমার নাফরমান ও অবাধ্য লোকদের আমরা পরিত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব ও আনুগত্য করি এবং শুধু তোমারই সামনে সিজদায় নত হই। আমাদের সমস্ত চেষ্টা সাধনা তোমারই জন্য। আমরা তোমারই সেবার জন্য উপস্থিত। তোমারই দয়ার প্রত্যাশী এবং তোমার আযাবের ভয়ে ভীত। তোমার আযাব যে তোমার অবাধ্য লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

এবার এই দোয়ার প্রথম বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন এবং ভেবে দেখুন ঃ

১ আপনি যখন বলেন, "হে আল্লাহ, আমরা তোমার সাহায্য চাই--" তখন এই প্রার্থনার সময় আপনার মনে কোন্ জিনিসগুলো রেখাপাত করে, কোন্ আশা আকাংখা ও উদ্দেশ্য আপনার হৃদয়ে জাগরুক থাকে, যা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চান? সে জিনিসটি এবং সে উদ্দেশ্য ও আশা কি আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলের অনুসরণ? সেই জিনিসটা কি আল্লাহর দীনের বিজয়? আল্লাহর পথে দৃঢ়তা ও অবিচলতা? তাঁর বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই এবং খোদাদ্রোহী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ? নাকি স্রেফ প্রবৃত্তির অভিলাষ পূরণ, বাতিল ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন, তার ধারকবাহকদের নৈকট্য লাভ এবং দুনিয়াদারদের কাছ থেকে সম্মান ও খ্যাতি অর্জন? একথা কি সত্য যে, অধিকাংশ দোয়ায় এই শেষোক্ত জিনিসগুলোই চাওয়া হয়ে থাকে? যদি একথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ভাববার বিষয় হলো, এ ধরনের লোকেরা কি আল্লাহর গযব ও তাঁর পাকড়াও সম্পর্কে এতোই বেপরোয়া হয়ে গেছে যে, তাঁর নাফরমানীর কাজে

সাফল্য লাভের জন্য তারই কাছে দোয়া করতে আরম্ভ করেছে? তাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ সবার চেয়ে বেশী আত্মাভিমানী এবং সবার চেয়ে বেশী প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তাঁর পাকড়াও -এর সময় যখন হবে তখন একটি মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হবেনা।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ. فَاِذَاجَاءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ-

"প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। তাদের মেয়াদ যখন ফুরিয়ে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয়না।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৪) তবে সেই নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। যার যা খুশী করতে পারে।

২ "আমরা তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই" আপনার এই দোয়া নিম্নের আয়াতে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করে কিনা ভেবে দেখুন ঃ

اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ..... وَلَمْ يُصِرًّا عَلٰى مَا فَعَلُوْاوَهُمْ يَعْمَلُوْنَ-

"কখনো কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে অথবা কোনো গুনাহর কাজ করে বসলে তারা তৎক্ষণাত আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে গুনাহ মাফ চায় এবং তারা জেনে বুঝে নিজেদের কৃত পাপাচারকে অব্যাহত রাখেনা।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

অর্থাৎ আপনার অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে যে, মূলত আপনি আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণকে নিজের সমগ্র জীবনের সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, জীবনের সকল কাজকর্মে, লেনদেনে, আচার ব্যবহারে তাঁরই হুকুম ও বিধিনিষেধ মেনে চলেন এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কখনো মানবিক দুর্বলতা বা প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনার বশে কোনো পদস্খলন ঘটে যায়, তবে সেটা অনুভব করা মাত্রই তৎক্ষণাত লজ্জা ও অনুশোচনায় মাথা নত করে দেন, আল্লাহর সামনে সকাতর মিনতি জানিয়ে ক্ষমা চান এবং পরবর্তীতে পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আগের চেয়েও বেশী চেষ্টা করেন, তাহলে বলা যায় যে, আপনি ক্ষমার শর্ত পূরণ করছেন। কিন্তু আপনার অবস্থা যদি এমন হয় যে, একেবারেই বেপরোয়াভাবে ও সচ্ছন্দচিত্তে তাঁর সীমা লংঘন করে চলেছেন, তাঁর শরীয়তকে অমান্য করে চলেছেন, তাঁর আয়াতগুলোকে পদে পদে কার্যত প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন, কোথাও স্থানীয় সামাজিক রসম রেওয়াজ মেনে চলছেন, কোথাও

বিদেশী আইন ও রীতিনীতির অনুসরণ করছেন এবং কোথাও অন্য কোনো মতবাদ বা নিজ প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী ও মনগড়া রীতিনীতি মেনে চলছেন, আর এগুলো অজ্ঞতা বা ভুলভ্রান্তিবশত নয় বরং সজ্ঞানে, সোৎসাহে, সানন্দে, পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও সাচ্ছন্দসহকারে দিনরাত করে চলেছেন, তাহলে এরপর দোয়া কুনুতে ক্রমাগত "তোমার কাছে ক্ষমা চাই" বলে আবেদন জানাতে থাকা আল্লাহর সাথে ঠাট্টামসকরা করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

"তাওবা করা ও গুনাহ মাফ চাওয়া"র প্রকৃত স্বরূপ ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গন্তব্য স্থলে পৌছার জন্য সঠিক পথ ধরে এগুচ্ছে। পথিমধ্যে কোথাও তার পায়ে কোনো নোংরা জিনিসের ছিটেফোটাও লাগুক, তা সে কোনোক্রমেই চায়না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং পূর্ণ সতর্কতা সহকারে পথ চলা সত্ত্বেও পথিপার্শ্বের কোনো নোংরা নালা থেকে তার পায়ে ময়লা লেগে গেলো। সে এটা টের পাওয়া মাত্রই অস্থির হয়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করতে লাগলো এবং যতো শীঘ্র সম্ভব শরীর থেকে এই ময়লা পরিষ্কার করে পুনরায় অধিকতর সতর্কতার সাথে নিজ গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হলো। আল্লাহর একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান বান্দার অবস্থা অবিকল একরকমই হয়ে থাকে। সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোথাও তার পা সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে গুনাহের নোংরামিতে পতিত হয়ে গেলে ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্রই সে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর কাছে তাওবা করে, ক্ষমা চায়, দান সদকা পর্যন্ত করে এবং ভবিষ্যত জীবনে আগের চেয়েও বেশী সাবধান হয়ে চলে।

কিন্তু যারা গুনাহর কাজ করা, আল্লাহর নাফরমানী করা ও তাঁর দীন থেকে বিপথগামী হওয়াকে অভ্যাস ও পেশায় পরিণত করে, যাদের জীবন ও সম্পদ কুফরী ব্যবস্থা টিকে থাকার জন্য সহায়কে পরিণত হয়, যারা তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তির সেবক ও প্রবৃত্তির অনুগত হয়, যাদের রক্ত পর্যন্ত আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উদগ্রীব ও অস্থির থাকে, যারা তাদের সন্তানদের পর্যন্ত খোদাদ্রোহিতার পথে চলা ও অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, যাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হয়ে থাকে খোদাদ্রোহিতার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং এতেই তারা উন্নতি ও প্রগতি নিশ্চিত হয় বলে মনে করে, অথচ বিবেকের দংশনে অথবা পৈত্রিক উত্তরাধিকারের চাপে বাধ্য হয়ে কিছু ইসলামী ইবাদত, রীতিনীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার অবলম্বন করে থাকে, তাদের মুখে "তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই" বলা অর্থহীন উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে গুনাহ মাফ হবে, না কি আযাব আরো বেশী হবে, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।

৩ দোয়া কুনুতের তৃতীয় স্বীকারোক্তি ও অংগীকার হলো, "আমরা একনিষ্ঠভাবে তোমাকে আমাদের একমাত্র মনিব ও প্রভু বলে স্বীকার করি।" এই স্বীকারোক্তি প্রদানের পর এখন আমরা কি বাস্তবিকই অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছি? এখন কি আমরা শুধু আল্লাহকেই আমাদের ইলাহ (সার্বভৌম ও একচ্ছত্র প্রভু) প্রতিপালক ও শাসকরূপে মানি? একমাত্র তাঁরই বিধান মেনে চলি? তারই আইন ও শরীয়তের অনুকরণ করি? একমাত্র তাঁরই আযাবের সবচেয়ে বেশী ভয় করি? একমাত্র তারই পুরস্কারের সবচেয়ে বেশী আশা পোষণ করি? তাঁরই বিধানকে বিজয়ী করার চিন্তায় বিভোর থাকি? একমাত্র তাঁরই রহমতের আশায় আশান্বিত থাকি? একমাত্র তাঁরই অংগীকারের প্রতি অনুগত থাকি? একমাত্র তাঁরই অভিভাবকত্ব কামনা করি? একমাত্র তাঁরই কাছে যাবতীয় আশা পোষণ করি? না কি বাস্তব অবস্থা এসব কিছুর বিপরীত? আল্লাহর প্রতি আমাদের অধিকাংশ আকীদা বিশ্বাস কি স্রেফ মৌখিক উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে? আমাদের বাস্তব কর্মকান্ড ও তৎপরতা কি নিজেদের ও অন্যদের খেয়ালখুশী ও কামনা বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যেই সীমিত? এখানে মনে রাখতে হবে যে, ঈমান ছাড়া কোনো সৎ কাজ গৃহীত হয়না। তাই ঈমানে কোনো দুর্বলতা থাকলে তা শুধরানোর কথা সর্বপ্রথম ভাবতে হবে।

৪ দোয়া কুনুতের ৪র্থ স্বীকারোক্তি ও অংগীকার হলো "আমরা একমাত্র তোমারই ওপর ভরসা করি।" আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা মুমিন ও মুসলিম হওয়ার অপরিহার্য দাবি। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ-

"মূসা তার জাতিকে বললো, হে জনতা, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো এবং মুসলমান হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।" (সূরা ১১ ঃ ১৮৪)

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার অর্থ হলো, সর্ব অবস্থায় ও সকল ব্যাপারে সঠিক পথের সন্ধান ও সাহায্যের জন্য আল্লাহর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করতে হবে। তাঁর কথার বিপরীত অন্য কারো কথা, তাঁর ভয়ের বিপরীত অন্য কারো ভয় এবং তাঁর পুরস্কারের বিপরীতে অন্য কারো পুরস্কারের পরোয়া করা চলবেনা। এমনকি রসূলগণ ও তাদের সহচরগণের ন্যায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও কার্যকর করার সংগ্রামে অন্য কারো ভীতি ও প্রলোভন, সুখ ও দুঃখ, প্রতাপ ও পরাক্রম, জাঁকজমক ও

শান শওকতকে আদৌ তোয়াক্কা করা চলবেনা। তাওয়াক্কুলের এই অর্থের আলোকে আপনি নিজের, নিজের মনমগজের ও সকল আচরণ ও কর্মকান্ডের পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এগুলো তাওয়াক্কুলের মানদন্ডে উত্তীর্ণ কিনা? আল্লাহ না করুন, আপনার অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে যে, মামুলী আর্থিক ও দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি, আত্মীয় স্বজনের অসন্তোষ এবং কিছু কিছু আরাম আয়েশ ও সুখস্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা যদি আপনাকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে বারবার "একমাত্র তোমার ওপরই আমরা ভরসা করি" এই স্বীকারোক্তি করা মিথ্যাচার নয়তো আর কি? প্রশ্ন হলো, তাহলে কোন্ ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করলেন?

৫ দোয়া কুনুতের মাধ্যমে দেয়া ৫ম স্বীকারোক্তি হলো, "আমরা তোমার সর্বোত্তম প্রশংসা করি।" এ কথাটার মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি যে আন্তরিকতা, একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর দীনের প্রতি যে আসক্তি, আকুতি ও উৎসর্গিত মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, আপনার বাস্তব জীবনে এবং দৈনন্দিন তৎপরতায় কি তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়? আপনি কি সেই অদৃশ্যজান্তা আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেন যে, তাকেও নিছক মৌখিক স্তাবকতা ও তোষামোদ দ্বারা মনভোলানো ও মতলব সিদ্ধি করা যাবে? আল্লাহর সাথে যারা চালবাজী ও চতুরতা করে তাদের ভালোমতো বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহও সর্বশ্রেষ্ঠ চালবাজ। শুধু তাই নয়, তিনি অন্তর্যামীও বটে। যারা আল্লাহর বিপরীতে অন্যান্যদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস করে অন্য কারো প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, আনুগত্য ও আসক্তি পোষণ করে এবং অন্য কেউ কার্যোদ্ধার ও উদ্দেশ্য হাসিল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করে অথচ সেই সাথে আল্লাহর নিছক মৌখিক প্রশংসা করার নীতি, অবলম্বন করে ও তাদের সামনেই আল্লাহ একদিন তাদের মুখোষ খুলে দেবেন। তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তার অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক থাকবেনা আর কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্যও আসবেনা। যেসব পাপাচারী ও দুর্নীতিবাজ লোকদের সেবা ও ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পেরে আজ গৌরব বোধ করা হয় এবং যেসব ফাসিক লোকের অভিভাবকত্ব ও নৈকট্য পেয়ে আজ গর্ব অনুভব করা হয়, কিয়ামতের দিন তাদেরই নেতৃত্বে তাদের ভক্ত ও অনুসারীদের আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৬ এরপর "আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, অকৃতজ্ঞ হইনা, তোমার নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাদের পরিত্যাগ করি একং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি" এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যে অংগীকার ব্যক্ত করা হয় তার আলোকে নিজের চেহারা দেখুন এবং নিজেই স্থির করুন যে, এই অংগীকার কতোটা পালন করা হচ্ছে। আপনি কি সত্যিই নিজের জীবনকে অকৃতজ্ঞতা থেকে পবিত্র করে

কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমান লোকদের সাথে এখন আর কোনো সম্পর্ক রাখেননা? আপনার প্রিয়তম ও অন্তরঙ্গতম বন্ধুই হোক, ভাই হোক, পিতা হোক, ছেলে হোক, জাতীয় নেতা হোক, কিংবা পীর মুরশেদ হোক-প্রত্যেকটি মানুষের সাথে কি আপনার সম্পর্ক এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? আপনার সমস্ত উপায় উপকরণ, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভা কি এখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতার পথেই ব্যয়িত হচ্ছে? বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই, আল্লাহ যে শক্তি ও উপকরণগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে আপনার আওতাধীন করে দিয়েছেন, কেবল সেগুলোরই পর্যালোচনা করুন। আল্লাহর বিধানে আপনার জন্য যেসব জিনিস বৈধ, কেবল সেসব জিনিসই কি আপনি চোখ দিয়ে দেখেন, কান দিয়ে শোনেন, জিহ্বা দিয়ে বলেন, মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, পাকস্থলিতে প্রবেশ করান এবং কেবল সেগুলোর জন্যই কি হাত পা নাড়ান? যাদেরকে আল্লাহ আপনার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেমন সন্তান, ছাত্র, শিষ্য, চাকর, ভৃত্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকজন, তাদেরকে কি আপনি আল্লাহর পছন্দীয় পথে চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং করে থাকেন? আপনার সকল শক্তি ও সকল উপায় উপকরণ কি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ এগুলো আপনাকে দয়া করে দিয়েছেন? এসব অনুগ্রহের জন্যে আপনি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন? নাকি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে জান, মাল ও মনমগজের শক্তিকে খোদাদ্রোহিতার সহযোগিতা দান ও আল্লাহর যমীনে গোমরাহী ও অরাজকতা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থে ও পার্থিব লাভ লোকসানের জন্যে পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে, কর্মচারী মালিককে এবং মুরীদ পীরকে পর্যন্ত ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনা, এমনকি পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ পর্যন্ত করে থাকে, সেখানে আল্লাহ ও তাঁর দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরে বিচ্ছেদ তো দূরের কথা, অসন্তোষ প্রকাশ করার প্রয়োজনও অনেকেই অনুভব করেনা। বাস্তব অবস্থা যখন এরূপ, তখন এমন অচেতনভাবে বারংবার এমন ভুল অংগীকার করার পরিমাণটা কি হতে পারে, ভেবে দেখা উচিত। হয় অংগীকার ও স্বীকারোক্তি অনুসারে নিজেকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে নেয়া উচিত, না হয় অনুরূপ স্বীকারোক্তি অংগীকার দেয়া বন্ধ করা উচিত। বাস্তব কর্মকান্ড দ্বারা যখন সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যে, "আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা জানাইনা বরং অকৃতজ্ঞতা জানাই এবং যারা তোমার অবাধ্য তাদেরকে ভালোবাসি" (নাউযুবিল্লাহ- তখন মৌখিক শোকর গুজারী ও ফরমাবরদারীর ভন্ডামীপূর্ণ দাবি করে লাভ কি? আল্লাহর শোকর তথা কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক উচ্চারণ ও জপ করার নাম নয় বরং আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য

ও দাসত্ব এবং তাঁর দেয়া প্রতিটি জিনিস ও শক্তিকে তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার নাম। আর দোয়া কুনুতের ৬ষ্ঠ অংশটুকুতে এই জিনিসটারই স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়ে থাকে।

৭ এরপর "হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি---- " থেকে দোয়া কুনুতের শেষ পর্যন্ত যে ওয়াদা, অংগীকার ও স্বীকারোক্তি দেয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখুন আপনার আনুগত্য, দাসত্ব, যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদত, নামায, সিজদা ইত্যাদি সবই কি বাস্তবিকপক্ষে শুধু আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে? না কি আপনি নিজের ঈমান, বিবেক, মনমগজ, দেহ ও মনের যাবতীয় শক্তির একটি দোকান খুলে বসেছেন এবং, এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো জিনিস যে কোনো উদ্দেশ্যে যে কেউ ইচ্ছা করলেই কিনে নিয়ে যেতে পারে? আপনার কি এই জিনিসগুলোর দাম পেয়ে গেলেই হলো? এরপর এর বিনিময়ে আপনাকে কোথায় একং কি উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়, তা নিয়ে কি আপনার কোনো মাথা ব্যথা নেই? যদি আপনার মনমগজ ও হাত পায়ের শক্তির ভাড়া আপনাকে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আপনি সুদ, জুয়া ও মদের ন্যায় জঘন্য কাজের ব্যবস্থাও অকুণ্ঠা চিত্তে করতে পারেন। আল্লাহর শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী আইনকানুনের প্রচার ও বাস্তবায়নের মাধ্যম হতে পারেন। সমগ্র কুফরী ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ারও মানসিকতা রাখেন, এমনকি কুফরীর বিজয় ও সত্যের পরাজয় নিশ্চিত করার জন্য নিজের ও অন্যদের রক্ত পর্যন্ত প্রবাহিত করতে পারেন -এই কি আপনার অবস্থা? আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এতে শুধু সাধারণ মানুষই নয় বরং অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষও বাধ্যবাধকতা ও অন্যন্যোপায় অবস্থার ওজর পেশ করে থাকেন। কিন্তু তারা আল্লাহকে সাক্ষী করে বলুক তো দেখি যে, তারা হারাম ও অবৈধ পন্থায় যে অর্থসম্পদ উপার্জন করে থাকেন, তা শুধু অনন্যোপায় অবস্থা ও জীবন বাঁচানোর পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে, না ভবিষ্যতের কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত যাতে বসে বসে খেতে পারে, সে জন্যও গোলা ভরে হারাম সম্পদ জমা করে রাখা হয়? এভাবে অর্জিত সম্পদ খাওয়ার সময় কি তারা তার প্রতি এতোটাই ঘৃণা ও অসন্তোষ অনুভব করে থাকেন, যতোটা ক্ষুধার কারণে মরনোমুখ কোনো ব্যক্তি বিষ্ঠা বা অনুরূপ নোংরা কোনো জিনিস বাধ্য হয়ে খাওয়ার সময় অনুভব করে? যে ব্যক্তি হালাল রুজি না পেয়ে একান্ত বাধ্য হয়ে মৃত প্রাণীর গোশত খায়, সে কি দুর্নীতিবাজ হারামখোর কর্মচারী আর সুদখোর ব্যবসায়ীদের ন্যায় অতো মজা করে তা খায়? জাতির একটি বিরাট অংশ যেমন সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে হারাম জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত এবং তারা তাদের জীবিকাকে হালাল পন্থায় পরিবর্তিত করে নেয়ার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করেনা, একজন নিরূপায় মুসলমান সেরূপ সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে কি মৃত জানোয়ারের গোশত খেতে পারে?

প্রচলিত কুফরীসুলভ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং অবৈধ ও হারাম জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং আরো উন্নত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাকে কি কোনো মতে নিরূপায় অবস্থা বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে?

প্রিয় ভাইয়েরা!

এখনো সময় আছে, আসুন, আমরা আমাদের ঈমান ও আখিরাতকে বাঁচানোর চিন্তা ভাবনা করি। নচেত একথা জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ আমাদের ব্যাপারে আদমশুমারীর রেজিষ্টার দেখে ফায়সালা করবেন না বরং আমাদের জীবনের বাস্তব কর্মকান্ড দেখে ফায়সালা করবেন। দোয়া কুনুতের 'একমাত্র তোমারই ইবাদত করি---এ অংগীকারের সাথে কতোখানি সংগতিপূর্ণ তা দেখে ফায়সালা করবেন। সেখানে দেখা হবে, মুমিনের আল্লাহর পথে যতোটা চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করা উচিত তা করেছে কিনা? তাঁর দীনের খিদমত ও পতাকাবহন করার জন্য কতোটা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে? দোয়া কুনুতের অংগীকার অনুসারে সে সত্যিই আল্লাহর রহতম ছাড়া আর কোনো জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ হয়নি তো? তাঁর আযাব ছাড়া আর কোনো জিনিসের ভয় পায়নি তো?

একটু ভেবে দেখুন, আপনার কাছে আল্লাহ তায়ালার যেসব অধিকার প্রাপ্য রয়েছে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কোনো চেষ্টা আপনি করছেন কি? এর জন্য কি আপনি কখনো চিন্তাভাবনা করেছেন? আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কোনো আঘাত খাওয়া বা ক্ষতি স্বীকার করাতো দূরের কথা, তার কোনো আকাংখাও কি কখনো আপনার মনে জন্মেছে? না কি ইসলামকে শুধু আপন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য নিজের সাথে জুড়ে রেখেছেন, যাতে কোনো ক্রান্তিকাল বা বিপদমুসিবত এলে ইসলাম বলে চিৎকার শুরু করা যায়? কিছু সভাসমিতি করা যায়, কিছু মিছিল ও শোভাযাত্রা করা যায়, শ্লোগান দেয়া যায়, কিছু লোককে ধোকা দিয়ে বোকা বানানো যায়, বিরোধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং নিজের কাজ উদ্ধার করার পর ইসলামকে আবার ঘরে বন্দী করে দেয়া যায়? আপনার ইসলাম প্রীতি এতোটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তো? এটা কি সত্য নয় যে, বর্তমানে মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইসলামের উপকারিতা কেবল এতোটুকুই যে, প্রতিষ্ঠিত খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তির চাকরীবাকরী, তার কাউন্সিলের সদস্যগিরি, তার সদয় দৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়া, বস্তুগত স্বার্থ অর্জন ও সংরক্ষণ এবং এ ধরনের আরো কিছু তুচ্ছ বস্তুগত উপকারিতা পাওয়া যায়? কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি এরূপ নয় যে, আল্লাহর দীন সাধারণভাবে কেবল ততোটুকই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে, যতোটুকু লোকেরা খেয়ালখুশী, প্রতিষ্ঠিত বাতিল শক্তির সন্তুষ্টি এবং দুনিয়ার পদমর্যাদা

লাভে কাজে লাগতে পারে। ভাবখানা এইযে, “তাওহীদের মানস সন্তান”রা এখন আর আল্লাহর দীনের খাদিম হতে ইচ্ছুক নয়, বরং আল্লাহর দীনই তাদের সেবা করুক -এটাই যেনো তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ!)[১৩]

আপনি যদি কুনুতের উল্লিখিত দোয়ার পরিবর্তে নিম্নোক্ত দোয়া পড়েন, তাহলেও আপনাকে একই ধরনের আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِىْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَ لَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ–

“হে আল্লাহ! তোমার হিদায়াতপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে সাথে আমাকেও হিদায়াত করো। তোমার শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে সাথে আমাকেও শান্তি ও নিরাপত্তা দাও। তুমি নিজে আমাকে পৃষ্ঠপোষকতা করো। তুমি যা কিছু আমাকে দিয়েছো, তাতেই বরকত দাও। তোমার ফায়সালার খারাপ প্রভাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। কেননা তোমার ফায়সালাই সবার ওপর কার্যকর হয়। অন্য কারো ফায়সালা তোমার ওপর কার্যকর হয়না। তুমি যার পৃষ্ঠপোষক হও, তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারেনা। হে আমার প্রতিপালক, তুমি বড়ই কল্যাণময় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।”[১৪] এই দোয়াটির ভিত্তিতেও নিজেকে খতিয়ে দেখুন।

আপনি আল্লাহর হিদায়াত, শান্তি ও নিরাপত্তা, বরকত ও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করার জন্য কি সত্যিই চেষ্টা করছেন? তা যদি না করেন তাহলে “তোমার ফায়সালাই সকলের ওপর কার্যকর হয়, অন্য কারো ফায়সালা তোমার ওপর কার্যকর হয়না” এই স্বীকারোক্তির অর্থ দাঁড়ায় এইযে, আপনি যেনো বলছেন ঃ নিজ ইচ্ছায় তো আমরা এ পথে চলতে চাইনা, আর এর জন্য কোনো আঘাত বা ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতেও প্রস্তুত নই, তবে তুমি যদি চাও, তবে অদৃশ্য শক্তির বলে এগুলোকে জোরপূর্বক আমাদের ওপর চাপিয়ে দাও।

---

১৩. উল্লেখ্য যে, এ নিবন্ধ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পূর্বে লেখা হয়েছিলো। তৎকালে এ দেশে ইংরেজদের শাসন চালু ছিলো। সে আমলে যখন কোনো আইনসভা বা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বা কোনো সরকারী চাকরী লাভের প্রশ্ন দেখা দিতো, কেবল তখনই জাতীয় নেতারা সবচেয়ে বেশী ইসলামের দরদে উতলা হয়ে উঠতো। এখনও কোনো বিপদ বা লাভজনক কোনো উপলক্ষ কিংবা নির্বাচন সামনে এলেই অনেকে ইসলামের কথা স্মরণ করে থাকে। আর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই অন্যান্য ইসলাম বিরোধী মতবাদের পতাকা ওড়াতে শুরু করে দেয়।

১৪. দোয়া কুনূত হিসেবে এই দোয়াটিও পড়া যায়।

শেষ দোয়া ও সালাম

এবার নামায থেকে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করা হয়, তার আলোকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ড ও তৎপরতার পর্যালোচনা করুন। নামায শেষে আমরা যেসব দোয়া করি তার একটি হলো এই ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

"হে আমার মনিব, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে তুমি নামায কায়েম করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ্! আমার এই দোয়া কবুল করো এবং হিসাবের দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও তোমার সকল মুমিন বান্দাকে মাফ করে দাও।"

এই দোয়ার শব্দগুলোকে সামনে রাখুন এবং ঠান্ডা মাথায়-চিন্তা করুন, নামায কায়েম করা, নামায কায়েমের নিশ্চয়তাদানকারী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত চেষ্টা সাধনা আপনি করছেন? এর জন্যে আপনার অন্তরে কতোখানি অস্থিরতা ও আবেগ উদ্দীপনা বিদ্যমান? নাকি আপনি নামায কায়েম করার অর্থ কিয়াম, (দাঁড়ানো) রুকু ও সিজদার অবস্থায় কয়েকটা ছক বাঁধা কথা আবৃত্তি করাই যথেষ্ট মনে করেছেন, আর ভাবছেন, নামায যেসব দায়িত্ব ও যেসব কাজ আপনার ওপর ন্যস্ত করে এবং যে দায়িত্ব পালন করার অংগীকার সে বারবার আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে, তা সব কেবল এই দোয়ার মৌখিক আবৃত্তির বরকতেই যাদুর মতো আপনা আপনি সম্পন্ন হয়ে যাবে? অথবা, আপনি কি নামাযকে শুধু একটা দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম মনে করেন, যার জন্য আপনার ওপর কোনো দায়দায়িত্ব বর্তেনা?

প্রিয় ভাই ও বোন!

সালাত হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। রসূল সা. সালাতকে ইসলাম ও কুফরের সীমা নির্ধারক আখ্যায়িত করেছেন। সালাত ছাড়া ইসলাম কাউকে নিজ আওতায় অবস্থানের অনুমতি দেয়না। তাই সালাত কায়েম করার তাৎপর্য কি ও দায়দায়িত্ব কি তা জেনে বুঝে সালাত আদায় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

সালাতের শেষে আমরা ডানদিকে ও বামদিকে আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ "আর্থ্যাৎ তোমাদের সকলের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক" এই দোয়া জানিয়ে সালাত সমাপ্ত করি। এখানেও একটু আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, চারপাশে আল্লাহর যতো বান্দা ও

সৃষ্টি বিদ্যমান; তাদের জন্য কি আপনার মন সত্যিই শান্তি ও আল্লাহর রহমত কামনায় সোচ্চার? তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এই সালামও কিন্তু ভন্ডামীপূর্ণ। এ সালাম মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি থাকা প্রয়োজন তার বাহন হতে পারেনা। অথচ সে উদ্দেশ্যেই সালামের প্রচলন করা হয়েছে।

ইকামাতে সালাতের তাৎপর্য

ইকামাতে সালাত বা নামায কায়েম করার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এমন একটি সমাজ কায়েম করা ও দৃঢ়ভাবে কায়েম রাখা, যার ভেতরে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমগ্র মুসলিম জাতি সামষ্টিকভাবে আল্লাহর স্মরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের বাস্তব নমুনা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ–

"আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই। কাজেই তোমরা আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম করো।" (তোয়াহা ঃ ২০)

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে নামাযের আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তা হলো, মানুষ যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না হয়ে যায়। একটু একটু বিরতি দিয়ে সারাদিন নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমরা স্বাধীন সেচ্ছাচারী ও লাগামহীন পশু নও বরং আল্লাহর সৃজিত সচেতন ও দায়িত্বশীল বান্দা। তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি তৎপরতার জন্য সর্বজ্ঞ আল্লাহর সামনে দায়ী ও জবাবদিহী করতে বাধ্য। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, নামাযের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক সমাজ গঠন, যা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে ঃ

১ সমাজের কোনো এক ব্যক্তিও আল্লাহকে ভুলে থাকতে, তাঁর সম্পর্কে উদাসীন থাকতে এবং তাঁর সামনে জবাবদিহীর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকতে পারবেনা। বরং প্রতিটি ব্যক্তি এই মর্মে সুদৃঢ় ও সুতীব্র চেতনা পোষণ করবে যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর পালিত ও জন্মগত বান্দা। তার কাছে যা কিছুই আছে তা আল্লাহরই দান ও আমানত এবং তাঁরই আনুগত্য ও আদেশ পালনে ব্যয়িত হবার জন্য রয়েছে। একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে প্রতিটি বিন্দু সম্পদের ও প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে।

২ এ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য এই হবে যে, সে যে কোনো মূল্যে আপন সর্বজ্ঞ ও মহিমান্বিত প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং তাঁর শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। পৃথিবীতে তার যতো কষ্ট হোক এবং যতো বড় উপকারিতা থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হোক, কোনো মতেই সে কারো অধিকার নষ্ট করা কিংবা কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার কারণ হবেনা এবং বিচার দিবসের মালিকের সামনে আসামী হয়ে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেবেনা।

৩ এ সমাজের সদস্যরা নিজের কোনো ভাইয়ের ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হতে দেখে তার প্রতি ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত হওয়া এবং তাকে তা থেকে বঞ্চিত করার ফন্দি ও ষড়যন্ত্র পাকানোর পরিবর্তে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় ধন সম্পদের মালিক বিশ্বপ্রভুর কাছে নিজের জন্য কল্যাণ ও ঐশ্বর্য চাইবে এবং অভাবে ধৈর্যধারণ ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহর শোকর গুজারী করবে।

৪ এ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিকার আদায়ের পূর্বে ও নিজের অধিকার আদায়ের চেয়ে বেশী নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তা পালনে সচেষ্ট হবে। কেননা আল্লাহর কাছে তাকে যে জবাবদিহী করতে হবে, তা তার অধিকার সম্পর্কে নয় বরং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ-

“অতঃপর সেদিন তোমাদেরকে অবশ্যই প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সূরা তাকাসুর)

৫ সে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমগ্র সমাজ হিদায়াত ও পথনির্দেশনার জন্য এবং সাহায্যের জন্য আপন প্রতিপালকের শরণাপন্ন হবে। তারা আল্লাহর অবাধ্য, বিদ্রোহী, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের বা তাদের চালচলন ও রীতিনীতির ধারে কাছে ঘেঁষতেও ভয় পাবে।

৬ সেই সমাজের লোকদের জিহ্বা ও কলম, দেহ ও প্রাণ এবং সকল উপায় উপকরণ ও শক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর অপছন্দীয় জিনিসগুলোকে নির্মূল করতে এবং তাঁর আনুগত্য ও পছন্দীয় জিনিসগুলোকে চালু করতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

৭ সেই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের জন্য বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং আল্লাহর সকল সৃষ্টির জন্য শুভাকাংখী, সর্বান্তকরণে তাদের জন্য শান্তি ও কল্যাণকামী এবং তাদের জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকবে।

৮ সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এতোটা আত্মমর্যাদাশীল, সাহসী ও বীর হবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতাপ ও পরাক্রমকে ভয় পাবেনা, আর কারো গোলামী মেনে নিতেও প্রস্তুত হবেনা। তাদের মনে ভয় যদি থাকে তবে তা শুধু মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর ভয়, আর কোনো কিছুর আশা ও লোভ যদি থাকে তবে তা শুধু মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের আশা।

৯ সেই সমাজের জনগণকে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অন্তত এতোটা পরিচিত করে তুলতে হবে যে, তারা ইসলাম ও তার শেখানো জীবন যাপন পদ্ধতিকে মোটামুটিভাবে এবং দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যকীয় বিধিসমূহ সম্পর্কে

ভালোভাবে ওয়াকিফহাল হতে পারে। তাদের ভেতরে ইসলামের প্রতি এতো প্রগাঢ় ভালোবাসা ও একাত্মতার সৃষ্টি হবে এবং তারা এ থেকে অর্জিত কল্যাণ ও সৎগুণাবলীকে এতো গভীরভাবে অনুভব করবে যে, এই জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শনকারী রসূলুল্লাহ সা. এর জন্য তাদের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে দরুদ ও সালাম বেরিয়ে আসবে।

মোদ্দাকথা, একটা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমগ্র জীবন ও যাবতীয় তৎপরতায় নামাযের এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটা ও তার বাস্তব ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়া উচিত। সালাতকে হতে হবে তাদের যাবতীয় তৎপরতা, কর্মকান্ড ও আশা আকাংখার আলোক স্তম্ভ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যখন এ রকম নয় এবং এ রকম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোনো চেষ্টা সাধনাও হচ্ছেনা, তখন এই পরিস্থিতির সৃষ্টিকারীদেরকে সে সব নামাযীর অন্তর্ভুক্ত করাও বিচিত্র নয়, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন এবং তার দাবির ব্যাপারেও বেপরোয়া। যেমন সূরা মাউনে বলা হয়েছে ঃ

"সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।"

আল্লাহ আমাদেরকে এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

আপনাদের ভালোভাবেই জানা আছে, সমগ্র কুরআন শরীফে নামায কায়েম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। নামায কায়েম করার এই নির্দেশের কারণেই একে ইসলামে অন্যতম স্তম্ভ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা ভেংগে গেলে আর ইসলাম কায়েম থাকতে পারেনা। এ কারণেই নামাযকে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নচেত নামাযকে নিছক "পড়া"র কাজ তো প্রত্যেক মুনাফেক ও করতো। তারা শুধু যে মুমিনদের সাথে জামায়াতে নামায পড়তো তা নয় বরং অন্যান্য পারিভাষিক ইবাদত এবং বাহ্যিক ধর্মীয় কর্মকান্ডেও মুসলমানদের চেয়ে পিছিয়ে থাকতোনা। কিন্তু যে জিনিস তাদেরকে মুসলমানদের দল থেকে বহিষ্কার করে মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত করে, তা হলো নামায কায়েম না করা, অর্থাৎ নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে যেসব কথাবার্তা বলা হয় তাতে সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান না হওয়া, তদনুসারে চেষ্টাসাধনা ও সংগ্রামে একাগ্রতা ও আন্তরিকতা সহকারে শরীক না হওয়া। এসব বিষয় সামনে রেখে ঠান্ডা মাথায় নিজের ঈমান ও ইসলাম, নামায ও তার দাবির এবং নিজের কার্যকলাপ, সংকল্প ও আশা আকাংখার পারস্পরিক পর্যালোচনা করুন। অতঃপর বুঝতে চেষ্টা করুন যে ইসলামে আপনার মান ও মর্যাদা কেমন? কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও রসূলের সামনে আপনার অবস্থা কি হতে পারে? আখিরাতে আপনার অবস্থান কোথায়?

আযানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য যে জিনিসটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধাবনের দাবি রাখে, তা হচ্ছে আযান। মুসলমানদের প্রত্যেক জনপদে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর পক্ষ থেকে নিম্নরূপ ঘোষণা জারি করা হয় ঃ

আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য নয়।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল। (অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে আমাদের হিয়াদাত ও পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন, তাই জীবনের করণীয় তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো এবং তারই আদর্শ অনুসরণ করো।)

তোমরা আল্লাহর ইবাদত (নামায) এর জন্য এসো।

(উদভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ না করে) মুক্তি ও কল্যাণে জন্য এসো।

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নয়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, এই ঘোষণাগুলো তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়, যারা নিম্নরূপ ঈমান তথা আকীদা বিশ্বাস পোষণের দাবিদার ঃ

১ আল্লাহ তায়ালাই বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র উপাস্য, প্রতিপালক, মালিক ও প্রকৃত সার্বভৌম শাসক। সকল বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের একমাত্র হকদার এবং মুসলমান অর্থ কেনো বিশেষ বর্ণ, বংশ, ভাষা বা দেশের লোক নয় বরং আল্লাহর আনুগত্য ও গোলামীর পথ অবলম্বনকারী একটি গোষ্ঠী।

২ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল এবং আমাদের এমন একজন পথপ্রদর্শক ও নেতা, যার অনুসরণ করা আমাদের জন্য ফরয। তাঁর কোনো একটি নির্দেশও ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্যকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য ইসলামের অভ্যন্তরে কোনো স্থান নেই।

৩ নামায ইসলামের স্তম্ভ এবং মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী।

৪ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় মুক্তি ও সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পথ অবলম্বন ও অনুসরণ।

বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদের প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর এই ঘোষণা (আযান) এরূপ নির্বিকার ও বেপরোয়াভাবে শুনতে থাকা যেনো এর সাথে তাদের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর এই আহ্বান শুনেও কোনো

প্রতিক্রিয়া না হওয়া আর যে কয়জন আযান শুনে নামায পড়তে আসে, তাদেরও না বুঝে নামাযের নির্ধারিত দোয়া সূরা আবৃত্তি করে চলে যাওয়া, নামায কায়েম করার প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং তা দ্বারা আমাদের ওপর কি কি দায়িত্ব বর্তে, তার কোনো তোয়াক্কা না করা বরং ক্রমাগতভাবে আল্লাহ বিমুখতা ও তাঁর নাফরমানীর আচরণ অব্যাহত রাখা আল্লাহর ক্রোধ ও গযবকে কিরূপ উস্কে দিতে পারে? আল্লাহর পক্ষ থেকে তো মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা বাকি রাখা হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের এ আচারণের জন্য আল্লাহর সামনে পেশ করার মত কোনো জবাব আছে কি? বিষয়টি খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আল্লাহর সাথে বারবার অংগীকার করে এবং স্বীকারোক্তি দিয়েও তা যারা ভুলে যায়, এমনকি প্রতিদিন কয়েকবার (আযানের ও নামাযের মাধ্যমে) সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিযে দেয়া সত্ত্বেও যারা "আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা" ভুলে যায়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, অচিরেই তাদের কানে একদিন এই কথাগুলো ধ্বনিত হবে ঃ

اَلْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ. ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ لَايُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ-

"আজ আমি তোমাদেরকে সেভাবেই ভুলে যাবো, যেভাবে তোমরা আমার সাথে আজকের দিনে সাক্ষাতের কথা ভুলে ছিলে। এখন তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে এমন কেউ নেই। এর কারণ হলো, দুনিয়ার জীবনের ধোকায় পড়ে তোমরা আল্লাহর হুকুম ও তাঁর হুশিয়ারীকে তামাশায় পরিণত করেছিলে। এখন না তোমাদেরকে আগুন থেকে উদ্ধার করা হবে আর না তোমাদের কোনো ওযর গ্রহণ করা হবে।" (সূরা জাছিয়া ঃ ৩৪-৩৫)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

প্রিয় ভাইয়েরা,
আল্লাহর দীন মানুষের সমগ্র জীবন জুড়ে বিস্তৃত এবং তার পুরোটাই মেনে চলা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। এর কোনো অংশ কারো ইচ্ছাধীন নয়। আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ অবিভাজ্য। তাই কারো একথা বলার অধিকার নেই যে, আমি ইসলামের এটুকু মানবো, আর ঐটুকু মানবো না।

অমুক অমুক ব্যাপারে ইসলামের অনুসরণ করবো আর বাদবাকি সব ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা কিংবা অন্য কারো মর্জি অনুযায়ী চলবো, আল্লাহর দীনে এরকম দর কষাকষি, কম বেশী বা আপোষ করার কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়ায় জীবন যাপনের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং তা জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ ও হিদায়াত দেয়। হয় পুরোপুরি এর হুকুম ও বিধান অনুসারে চলতে হবে, নচেত তা ছেড়ে অন্য কোনো আদর্শ বা বিধান অবলম্বন করতে হবে। এটা আল্লাহর অকাট্য ফায়সালা। আল্লাহর কাছে এ ধারণা গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সহনীয়ও নয় যে, তাঁর সত্তায়, গুণাবলীতে, ক্ষমতায় বা অধিকারে অথবা তার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞায় কোথাও অন্য কাউকে শরীক করা হবে। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِافْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا–

"আল্লাহর সাথে আর কাউকে কোনোভাবে শরীক করা হবে এটা তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। এ মহাপাপ ছাড়া অন্যান্য পাপ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে ব্যক্তি শরীক করে, সে এক মহাপাপী।" (আননিসা ঃ ৪৮)

সুতরাং শিরক হচ্ছে সেই মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ ক্ষমার কোনো সুযোগ রাখেননি। তাই আল্লাহকে যারা মানে, তাদের কাছে তাঁর দাবি হলো, তোমরা নিজেদেরকে আমার শর্তহীন আনুগত্যে এবং আমার রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণে সমর্পণ করে দাও। তিনি এর চেয়ে কম কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালাকে মুখ দিয়ে স্রষ্টা মালিক ও মনিব মানা এবং জীবনে তাঁর আনুষ্ঠানিক ইবাদত উপাসনার কাজটি পৃথিবীতে কোনো না কোনো পন্থায় আবহমানকাল ধরেই হয়ে আসছে। এখনও দুনিয়ার অধিকাংশ জাতি এ কাজটি কোনো না কোনোভাবে করে চলেছে। কিন্তু একমাত্র আল্লাহকেই একক ইলাহ বা উপাস্য মেনে নিয়ে সমগ্র জীবনকে তাঁর হুকুমের আনুগত্যে ও গোলামীতে সঁপে দেয়া এবং শুধু আল্লাহর সত্ত্বা নয় বরং তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও এখতিয়ারে পর্যন্ত কোথাও কাউকে শরীক না করা এমন একটি বিষয়, যাকে চিরকালই মানুষ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে উদাহরণ দিতে গেলে মানুষকে রেলগাড়ীর এমন এক বেকুফ চালকের সাথে তুলনা করা যায়, যে রেলগাড়ির চাকাকে সঠিকভাবে রেল লাইনের ওপর দিয়ে চালানো নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় মনে করে এবং কোনো খোলা ময়দান, কোনো সুদৃশ্য পার্ক বা কোনো পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভিভূত হয়ে রেল গাড়িকে লাইন

থেকে নামিয়ে ঐসব মনোরম দৃশ্যের দিকে চালিয়ে দিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলে। মানবতার কাফেলা এভাবেই বারংবার প্রবৃত্তির খায়েশ ও শয়তানের প্রবঞ্চনায় বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর নির্ধারিত জীবন চলার রাজপথ ও তার জায়গায় জায়গায় আল্লাহর বিভিন্ন বিধিনিষেধের আকারে যে নিরাপত্তা ও সতর্কতা সংকেত (Cautions) উৎকীর্ণ রয়েছে, তাকে খামোখা নিজের বিবেকবুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার অন্তরায় মনে করে এসেছে এবং মানব জীবনের গাড়িকে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপদ রাস্তার বাইরে নামিয়ে এনে বারবার ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। আর আল্লাহর রসূলগণ বারবার এসে এই গাড়িকে নিরাপদ ও সঠিক রাস্তার ওপর তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

"হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করো। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের আসলেই আর কোনো মাবুদ নেই।" (সূরা ৭ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫) কিন্তু নবীগণের এসব শিক্ষা এবং নামাযে একাধিকবার স্বীকারোক্তি ও অংগীকার দেয়া সত্ত্বেও আমাদের অবস্থাটা খতিয়ে দেখুন তো? নিজের সমগ্র জীবন, স্বভাব চরিত্র ও কর্মকান্ড সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মনে যাচাই করে ভাবুনতো যে, আমরা কি করছি আর আমাদের কি করা উচিত ছিল? নিজ মুখে আমরা আল্লাহর সাথে কি কি ওয়াদা করে থাকি আর আমাদের কাজ তাকে সত্য প্রমাণ করে, না মিথ্যা প্রমাণ করে? আমরা কি গ্রামোফোন বা মাইক্রোফোনের মতো হয়ে যাইনি যে, আমরা মুখ দিয়ে সব রকম কথাই বলছি কিন্তু কাজের বেলায় আমরা যেমন ছিলাম তেমনই এক প্রাণহীন যন্ত্রের মতো নির্বিকার ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছি? শুধু যদি নির্বিকার থাকতাম, তাহলেও তো বলতে পারতাম যে, উদাসীনতা ও নিষ্ক্রীয়তায় আক্রান্ত হয়ে গেছি বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা এ রকম দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের প্রতিটি কাজ আমাদের কৃত অংগীকারের বিরোধী ও পরিপন্থী। আর এতদসত্ত্বেও আমরা এই কর্মপন্থা অব্যাহত রেখেছি এবং দুনিয়ার সুখ শান্তি লাভের জন্য পরিণাম চিন্তা বর্জন করে অন্যকে পেছনে ফেলার জন্য হণ্যে হয়ে ছুটে চলেছি। আল্লাহ আমাদের সাবধান করে বলে দিয়েছেন যে "তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ অর্জনের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতে থাকতে কবরে পৌঁছে যাবে" এবং "যে নামাযীরা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন ও বেপরোয়া, তাদের জন্য রয়েছে সর্বনাশা পরিণতি"। কিন্তু এ দুনিয়ায় কোনো কিছু কেবল মানুষ চাইলেই হয়ে যায়না। নচেত শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের আকাঙ্খা কার না আছে? শুধু চাইলেই যদি সবকিছু হতো, তাহলে পৃথিবীতে ক্ষয়ক্ষতি, অন্যায়, অত্যাচার ও দুঃখ কষ্টের অস্তিত্বই থাকতোনা। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে নিজের খলীফা তথা প্রতিনিধি নিযুক্ত

করেছেন। তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা দিয়ে তার দায়িত্বে যে কাজ অর্পণ করেছেন সেটি হচ্ছে মানব সমাজকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার ভেতর থেকে আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার বিলোপ ও উচ্ছেদ সাধন। এ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, সমগ্র জীবনে আল্লাহর আনুগত্যকে ও রসূলের নেতৃত্বকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করবো। যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পর্ক রাখবে তাদের সাথে আমরাও সম্পর্ক রাখবো, যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাদের সাথে আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করবো। নিজেদের নামায ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে জীবনের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবো। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতে প্রদত্ত অংগীকার ও প্রতিশ্রুতির দায় দায়িত্ব বহন ও দাবি পূরণ করার চিন্তা ভাবনা করবো। যেসব কাজ পেশা ও ব্যস্ততা আমাদের আল্লাহর প্রতিনিধিসুলভ পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং আল্লাহর নির্ধারিত জীবন লক্ষ্যের বিপরীত, তা বর্জন করবো। যে পথে চলে অন্যরা তথা নবীগণ ও পূন্যবানগণ এই লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন সেপথ ধরে চলবো এবং এই মনযিল ও জীবনের লক্ষ্য অর্জনের পথে সংগ্রামী সাথী খুজে বের করবো, যাতে ইসলামের পথে বিশেষতঃ ইসলামের সামষ্টিক তথা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে তা সামষ্টিক শক্তি দ্বারা দূর করা যায়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শুধু ওযু গোসল, পবিত্রতা, বিয়ে, তালাক, নামায ও রোযার বিধানই দেননি যে, ইসলামকে এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। বরং আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাইরে জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন এবং এগুলোর প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য মূলনীতি, আদেশ নিষেধ ও নির্দেশনাও দিয়েছেন। আল্লাহ ও রসূল আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইন আদালত ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও আর্থিক লেনদেনের নীতিমালা দিয়েছেন। এমনকি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক আইন এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত স্বতন্ত্র বিধানও দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ ও রসূল আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, এগুলোকে সামগ্রিকভাবে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর প্রত্যাখ্যান করলে সকল সৎ কাজ বাতিল, সার্বিক বিনাশ ও চিরন্তন বিপর্যয় অনিবার্য বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ ও রসূল যে ধরনের মুসলমান চান তা হতে হলে ইসলামকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে হবে। এটা করার পথে যদি কোনো বাধা থাকে এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশ প্রতিকূল হয়, তাহলে এই বাধা দূর করার জন্য এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য সর্বান্তকরণে ও সর্বশক্তি দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাতে হবে। যতোক্ষণ আল্লাহ ও রসূলের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা এবং তার হুকুম আহকাম

ও নির্দেশাবলী পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ভূখন্ডে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত ও চালু না হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা আকাশে যেমন পূর্ণ হচ্ছে, পৃথিবীতেও তেমনিভাবে পূর্ণ না হবে, ততোক্ষণ এই সংগ্রাম থেকে ক্ষান্ত হওয়া ও বিশ্রাম নেয়া চলবেনা। এরই নাম ইকামাতে দীন তথা ইসলাম কায়েম করা। একেই বলে ইসলামী রাষ্ট্র ও হুকুমাত প্রতিষ্ঠা।

এতো বিপুল সংখ্যক বালু কোথাও একত্রিত হলে তা মরুভূমি হয়ে যেতো এবং এতো ফোঁটা পানি একত্রিত হলে বন্যা সৃষ্টি হয়ে যেতো। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দুনিয়াতে এতো বিপুল সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কোথাও ইসলাম কায়েম নেই! আল্লাহর দোহাই, উদাসীনতার ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ নিজ কর্মকান্ডের সমালোচনা পর্যালোচনা করুন।

এতো মুসলমান থাকতে ইসলামী শাসন নেই কেন?

মুসলিম বিশ্বের যেসব ব্যক্তি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাদের গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি মুসলমান থাকতে তাদের ঈমান আকীদা সম্বলিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই কেন? এই শোচনীয় বিপর্যয়ের কারণ কি? এটা একটা বাস্তব ব্যাপার যে, প্রত্যেক সভ্য ও সচেতন জাতির জীবনপদ্ধতি তাদের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও জীবনাদর্শের প্রতীক হয়ে থাকে। তাই মুসলমানদের মধ্যে যদি ইসলামী জীবন পদ্ধতি প্রচলিত না থেকে থাকে, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, গালভরা বুলি ও ইসলামী শ্লোগান সত্ত্বেও তারা ইসলামকে নিছক একটা ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছে। একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তাকে আপন মনমগজে স্থান দেয়নি। তাই তারা এর পরিবর্তে যা কিছু গ্রহণ করেছে, তা তাদের সামষ্টিক জীবন ব্যবস্থা (তথা সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, আইন ও রাজনীতি ইত্যাদি) থেকে স্পষ্ট। এগুলোকে আপনি অন্য যে নাম চান দিতে পারেন কিন্তু তা কখনো ইসলামী জীবনব্যবস্থা নয়। আর তা যদি কুরআনের শেখানো ন্যায়সংগত জীবন পদ্ধতি না হয়ে থাকে। তাহলে আপনিই বলুন যে, "সত্য দীনকে ত্যাগ করার পর গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে?" অথচ গোটা মুসলিম জাতি ইহুদীদের মতোই আত্মপ্রবঞ্চনা ও অবাস্তব কল্পনা বিলাসে মত্ত। ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর এমন কোনো দিক নেই, যার শেষ সীমায় তারা পৌঁছে যায়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও "মুসলিম" নামের সেই অসাধারণ ও অতীব মর্যাদাপূর্ণ পদটি একরকম বিনা পরিশ্রমেই আমাদের করায়ত্ব হয়ে আছে, যা নবীগণের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষাসমূহ অতিক্রম করে অর্জন করেছিলেন। এ উপাধি অর্জন

করতে তাঁকে পৈতৃক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নমরুদের ভয়াবহ চিতার আগুনের কাষ্ঠ হতে হয়েছিলো, যুগ যুগ ধরে সহায় সম্বলহীন ও সংগীহীন অবস্থায় দেশে দেশে যাযাবর বেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো, যাযাবর জীবনের এক পর্যায়ে বার্ধক্যের শেষ সহায় একমাত্র তরুণ পুত্র ঈসমাইলের গলায় ছুরি চালাতে হয়েছিলো এবং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি "আমার নামায, ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য নিবেদিত" এই উক্তির বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন। সেই উপাধিটা আমাদের ধারণা মতে আমাদের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, আমরা যা খুশী তাই করে বেড়ালেও এই পবিত্র পদ ও পদবীটি থেকে যেনো কখনো বঞ্চিত হবোনা। আর এই পদ এ পদবীটি অর্জন করার জন্য এখন আমাদের কাছে শুধু কোনো মুসলমান নামধারী পরিবারে জন্ম নেয়াই যেনো যথেষ্ট। এরপর আমাদের জন্য সমস্ত পাপাচারের পথ উম্মুক্ত। যেমন খুশী পাপাচারী জীবনযাপন করতে থাকবো। আল্লাহকে অস্বীকার করে নাস্তিক হবার সুযোগ এলে তাও করবো। গোটা জীবনকে খোদাদ্রোহীদের আনুগত্যে সোপর্দ করবো এবং আল্লাহর দেয়া সকল সহায়সম্পদ বাতিল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পথে উৎসর্গ করবো, (নাউযুবিল্লাহ) তবুও জান্নাত পাওয়ার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকবো, রসূলের সুপারিশ পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকবেনা এবং আমাদের মুসলমান থাকাতেও কোনো অসুবিধা হবেনা। বড়জোর কয়েকদিন দোজখ ভুগে তারপর জান্নাতে চলে যাবো। ভাবখানা এইযে, মুসলমানদের বংশে জন্ম নিয়েই আমরা যেনো আল্লাহর বড় কুটুম্ব হয়ে গেছি।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, ইহুদীদের তাহলে দোষ কি ছিলো? তারাও তো যুক্তি ও বিবেকের মাথা খেয়ে এই কথাই বলতো যে, সর্বাবস্থায় বেহেশ্‌ত তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। আর অতিরিক্ত অহংকার ও উচ্ছৃংখলতার দরুণ দোজখে যদি যেতেই হয়, তবে তাও দিন কয়েকের জন্য মাত্র। তারপর বগল বাজাতে বাজাতে আবার বেহেশতে চলে যাবো। তারা বলতো ঃ

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً-

"দোজখের আগুন আমাদেরকে মাত্র কয়েক দিনই স্পর্শ করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ৮০)

কিন্তু এ কারণেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ঃ

"তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো গ্যারান্টি লিখিয়ে নিয়েছে নাকি, না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এ রকম মনগড়া কথাবার্তাই বলে থাকো?" (সূরা বাকারা ঃ ৮০)

ইহুদীরা আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক ইবাদত করতো অনেক দৈনন্দিন কাজকর্মেও শরীয়তের অনুসরণ করতো, সত্য দীনের অল্প কিছু কথা বাদে অন্যান্য

ব্যাপারে কুফরীর সাথে আপোষ করে নিয়েছিলো এবং প্রবৃত্তির খায়েশ মেটানোর জন্য সেগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা দিতো। কিন্তু তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছিলো এবং আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেছিলেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ-

"তোমরা আল্লাহর কিতাবের খানিকটা মানো আর খানিকটা মানোনা, তাইনা? মনে রেখো, আল্লাহর দীনের সাথে এ রকম আচরণ করলে তার পরিণাম দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

প্রিয় ভাইয়েরা, মনে রাখবেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কোনো বর্ণ, বংশ, দেশ বা পরিবারের ভিত্তিতে হয়না। বরং শুধু তাঁর দাসত্ব এবং তাঁর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه-

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও খারাপ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল, ৭-৮)

অতঃপর সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে খোলামেলা ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا، لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا، ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَابًا، اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا، يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ-

"সেদিন জিবরীল এবং ফেরেশতারা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কারো ক্ষমতা থাকবেনা দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া টুশব্দটিও করার আর অনুমতি পেলেও সে কেবল ন্যায়সংগত ও অত্যাবশ্যকীয় কথাই বলতে পারবে। সেদিনটি অবশ্যই আসবে। এখন যার ইচ্ছা হয়, নিজ প্রতিপালকের কাছে নিজের জন্য উত্তম আবাসস্থল বানিয়ে নিক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছি। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় বসে যেসব কাজ করেছে, তা দেখতে পাবে।" (সূরা আন্ নাবা, ৩৮-৪০)

যারা রসূলের সুপারিশের দাবিদার এবং মুসলমান নামধারী হওয়া সত্ত্বেও বাতিল সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পাপাচারী নেতৃত্ব মেনে নেয়, কিয়ামাতের দিন তাদের কি শোচনীয় অবস্থা হবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

"সেদিন প্রত্যেক যুলুমবাজ ও পাপাচারী অনুশোচনা করে বলবে, হায়, আমি যদি রসূলের (যাঁর রিসালাতকে মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলাম) প্রদর্শিত পথ (তাঁর নেতৃত্ব) কার্যকরভাবে গ্রহণ করে নিতাম, তবে কতো ভালো হতো! হায়, আমি যদি অমুক ফাসিককে বন্ধু না বানাতাম। ঐ হতভাগা তো সঠিক পথ আমার সামনে প্রতিভাত হওয়ার পর পুনরায় আমাকে বিপথগামী করেছে। শয়তান তো মানুষকে লাঞ্ছিত করার কাজে খুবই দক্ষ। তখন রসূল (সা.) (এসব লোকের পক্ষে সুপারিশ করার পরিবর্তে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি তোমার এই কুরআনকে পেছনে ফেলে রেখে দিয়েছিলো। (এবং আমাকে ও তোমার দীনকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করেছে।)" (আল ফুরকান, ২৭-৩০)

একটু ভাবুনতো, মুসলমানরাও যদি আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে অন্য মতবাদের অনুসরণ শুরু করে দেয়, আল্লাহর নির্দেশাবলীকে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ ও নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে, সত্য দীনকে বাতিল ব্যবস্থার নোংরামি থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টার পরিবর্তে উল্টো এই দু'টির সংমিশ্রণ ঘটানোকে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও কুরআনে উঁচু মানের পারদর্শিতার পরিচায়ক মনে করতে থাকে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মৌখিকভাবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করা ও মাথা নোয়ানোকে লজ্জার ব্যাপার মনে করে; সারা দুনিয়ার মানুষকে ইসলাম ও তার কল্যাণকারিতার উপদেশ দিতে থাকে অথচ নিজে তার অনুগত হতে প্রস্তুত হয়না এবং নামায কায়েমের অনিবার্য দাবিসমূহ পূরণ করা তো দূরে থাক, নিছক আনুষ্ঠানিকভাবে নামায পড়াও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তারা কিসের ভিত্তিতে আশা করে যে, তাদের পরিণাম আল্লাহর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত অন্যান্য জাতির পরিণামের চেয়ে ভালো হবে? আল্লাহর ওয়াস্তে গাফলতী ও অলসতার গভীর নিন্দা থেকে জেগে উঠে নিজের স্বভাব চরিত্র ও কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি দিন এবং ইনসাফের সাথে বলুন যে, পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর পদাংক অনুসরণ করে আমরা সেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে পেতে পারি, যার ওয়াদা আল্লাহ একটি নিষ্ঠাবান মুসলিম জাতির জন্য করেছেন? আল্লাহর আইন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। নবীর ছেলেও খোদাদ্রোহী হলে তাকে তিনি পানিতে ডুবিয়ে দেন। সেখানে তো শুধু কৃতকর্মের ভিত্তিতে কর্মফল স্থির করা হবে, কে কার বংশধর বা প্রিয়জন, তার ভিত্তিতে

নয়। নিজের পদমর্যাদা ও দায়দায়িত্ব কি জানুন, ইসলামের যে আমানত আল্লাহর রসূল আপনার ওপর অর্পণ করে গেছেন তার দায়দায়িত্ব অনুভব করুন। নবুয়্যতের দায়িত্ব এখন কিয়ামত পর্যন্ত নবীর উম্মাতকেই পালন করতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর সর্বশেষ রসূলের শিক্ষা মুসলমানদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা অন্য সকল মানুষের কাছে পৌছে দেয়া তাদেরই কর্তব্য। আল্লাহ বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

"এখন পৃথিবীতে তোমারাই সেই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে।" (আলে ইমরান, ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

"আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা অন্যান্য মানব জাতির সামনে এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে পারো যে, ইসলামের যে আমানত রসূল তোমাদের কাছে সোপর্দ করেছিলেন, তা তোমরা সমগ্র মানব জাতির কাছে পৌছে দিয়েছো, আর রসূল তোমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, দীনের দায়িত্ব তিনি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।" (বাকারা, ১৪২)

আল্লাহর এই আমানতকে উম্মতের কাছে ন্যস্ত করার পর সে সম্পর্কে রসূল সা. বলেন ঃ

"আমার প্রাণ যার মুঠোর মধ্যে, সেই আল্লাহর কসম, সৎ কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, দুষ্কৃতিকারীদের বাধা দেয়া এবং তাকে সৎ কর্মের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য কাজ। এ কাজ না করলে আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের হৃদয়ের পাপের কালিমা সৎকর্মশীলদের অন্তরেও ঢুকিয়ে দেবেন অথবা তাদের ওপর যেমন অভিশাপ করেছেন (অর্থাৎ ইহুদীদের ওপর) তেমনি তোমাদের ওপরও করবেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব

সূরা নিসার এক স্থানে আল্লাহ তায়ালা প্রথম নবী থেকে শেষ নবী সা. পর্যন্ত বহু সংখ্যক নবীর পর্যালোচনা করার পর তাদের সকলকে দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

"এই সকল রসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। যেনো তাদেরকে পাঠানোর পর মানুষ আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর সময় কোনো ওযর আপত্তি না তুলতে পারে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও কুশলী।" (সূরা নিসা : ১৬৫)

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মানব জাতির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে কোনোই কমতি না থাকে, সেজন্য একদিকে যেমন প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির প্রাক্কালে তার কাছ থেকে আল্লাহর প্রভূত্ব মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি ও অংগীকার আদায় এবং মানুষকে ন্যায় ও অন্যায়ের বাছবিচারের সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তেমনি অপরদিকে এই ব্যবস্থাও করেছেন যে, তাঁর কাছে চূড়ান্ত জবাবদিহীর জন্য উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তিনি নিজের রসূলগণের মাধ্যমেও তাকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার এবং দীনের অনুসরণ না করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। এরপরও যদি কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, তবে তার কোনো দায় দায়িত্ব আল্লাহ বা তাঁর রসূলের ওপর বর্তাবেনা। এ দায়িত্ব হয় স্বয়ং ঐ ব্যক্তির ওপর বর্তাবে, যে আল্লাহর বার্তা পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেনি, নচেত যারা সত্য ও সঠিক পথ জানা সত্ত্বেও আল্লাহর অন্ধ বান্দাদেরকে বিপথগামী হতে দেখেও তাদেরকে সুপথ দেখায়নি ও সতর্ক করেনি, তাদের ওপর বার্তাবে।

সম্মানিত ভ্রাতৃমন্ডলি, মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া ও জবাবদিহী করার সময়টি আমাদের কাছে যে কোনো মুহূর্তে আকস্মিকভাবেও উপস্থিত হতে পারে। সে সময়টি আসার আগে কুরআনের আলোকে আমাদের নিজ নিজ জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর দৃষ্টি দিয়ে দেখে নেয়া উচিত, আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নিজের শেষ নবীকে প্রেরণ করেছেন এবং রসূলের পর তিনি যে কাজ আমাদেরকে "শ্রেষ্ঠ উম্মাত" ও "মধ্যমপন্থী জাতি" হিসেবে অর্পণ করেছেন, তা পালনে আমরা কি কি, কতোটুকু উদ্যোগ নিয়েছি এবং কতোটুকু চিন্তাভাবনা ও চেষ্টাসাধনা করেছি? কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি বা ব্যক্তিগত তাকওয়া, পরহেজগারী ও দীনদারী কামনা করেননা বরং একটু আগেই যেমন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নিজ জাতির এবং নিজ জাতির বাইরে যতোদূর যাওয়া সম্ভব অন্যান্য লোকদেরও হিদায়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব এখন শেষ নবী সা. এর উম্মাতের ওপরই ন্যস্ত। আমরা যদি কাজ না করি বা অসম্পূর্ণভাবে করি

তাহলে আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শনের জন্য দায়ী হবো। নামায রোযা ও অন্যান্য ফরয কাজের ন্যায় এ কাজেও শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

এ ছাড়া এটাও পার্থিব জীবনের একটা সর্বস্বীকৃত সত্য, যে জাতি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, তার জন্য যা করা দরকার তা করেনা এবং তা অর্জন করার জন্য ক্রমাগত ত্যাগ, কুরবানী ও সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত থাকেনা, ধরাপৃষ্ঠ থেকে তার অস্তিত্ব মুছে যাওয়া তেল ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপের নিভে যাওয়ার মতোই অবধারিত।

দাওয়াতের পথে প্রথম পদক্ষেপ

ইসলামের বাগান উজাড় হয়ে গেছে, বাগানের মালীরাও বাগানকে রেখে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। দুনিয়ার চাকচিক্য তাদেরকে এতোখানি ভড়কে দিয়েছে এবং দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ তাদেরকে এতোখানি অভিভূত করে দিয়েছে যে, কেউ বা পাশ্চাত্যের মতবাদগুলোর পেছনে আবার কেউবা প্রাচ্যের মতবাদগুলোর পেছনে উম্মত্ত হয়ে ছুটছে এবং তার যাদুমন্ত্রে বশীভূত হয়ে উভয় গোষ্ঠী ইসলামের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়ার কাজে পাল্লা দিয়ে অংশ গ্রহণ করছে। এ পরিস্থিতিকে শুধরানো ও স্বাভাবিক করার প্রথম সমীচীন পদক্ষেপ হলো, আল্লাহর দীন, তার দাবি, চাহিদা ও দায় দায়িত্বকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তাকে একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং এই সংকল্প সহকারে গ্রহণ করতে হবে যে, ভবিষ্যতে শিরায় রক্ত, দেহে প্রাণ ও স্নায়ুতে চেতনা থাকতে জেনে বুঝে কখনো ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির পরিপন্থী কোনো কাজ করবো না। আল্লাহ স্বীয় রসূলকে আদেশ দিয়েছেন যে,

قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ-

“ওদেরকে বলে দাও, আমাকে সর্ব প্রথম আত্মসমর্পণকারী হবার আদেশ দেয়া হয়েছে” (সূরা আল আন'আম ঃ ১৪)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-

“বলো, আমার নামায, (তথা শরীরের সকল শক্তি) আমার কুরবানী, (অর্থাৎ আমার সকল সহায় সম্পদ) আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য, যার কোনো অংশীদার নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মস্তক অবনতকারী।” (সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২-৬৩)

দাওয়াতের পথের দ্বিতীয় পদক্ষেপ

এই পথের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, আশপাশের চারদিকে যে অগণিত মুসলমান ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন রয়েছে এবং না জানা ও না বুঝার কারণে ইসলাম বিরোধী জীবন যাপন করেছে, তাদেরকেও আপনি যা কিছু বুঝেছেন তাই বুঝবার ও করবার আহবান জানাবেন। অর্থাৎ তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, খাঁটি বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ মুসলমান হতে হলে শুধু তাত্ত্বিক ও আদর্শিক পর্যায়ে নয় বরং নিজের জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে। চরিত্র ও কাজ দ্বারা সমর্থিত হয়না ইসলামের জন্য এমন মৌখিক স্বীকারোক্তি আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় আর এ দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়না। তাদেরকে বলতে হবে, মুসলিম সমাজের নিষ্ক্রিয়তা দূর করা, মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা চালু করার দায়িত্ব অনুধাবন করানো এবং জনসাধারণকে ইসলামী আকীদা ও উদ্দেশ্যের দিকে আহবান জানানোর দায়িত্ব প্রত্যেক মুমিনের ওপর অর্পিত। মুসলমানদের মধ্যে পুরোহীত শ্রেণীর কোনো অস্তিত্ব নেই, যাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানই ইসলাম প্রচারক এবং সাধ্যমত ইসলাম প্রচার করা তার কর্তব্য। যারা এসব কথা উপলব্ধি করবে, তাদেরকে একদিকে বুঝাতে হবে আল্লাহ বিমুখ ও খোদাদ্রোহী সমাজ ও রাষ্ট্রে মুসলমান সুলভ জীবন যাপন করা কেনো ও কতোটা কঠিন? এরূপ সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের কতোখানি অংশ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং বাতিল জীবন পদ্ধতির কারণে পৃথিবীতে কি পরিমাণ দুর্নীতি, দঃশাসন ও অরাজকতা বিরাজ করছে? অপরদিকে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার সুফল, বরকত ও তার দাবি এক এক করে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে একথাও বুঝাতে হবে যে, এই সুফল অর্জন এবং মানবজাতিকে বর্তমান যুলুম শোষণ ও নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে নির্ভেজাল ইনসাফ ও সুবিচার সরবরাহ করার জন্যও ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী সমাজ, ইসলামী আইন ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা জরুরী। এটা একটা মৌলিক দীনি কর্তব্য এবং অন্যান্য সামষ্টিক কর্মকান্ডের ন্যায় এ কাজও সংঘবদ্ধ চেষ্টা সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

এ পথের তৃতীয় পদক্ষেপ

মুসলমানদের মধ্যে যখন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার চেতনা সঞ্চারিত হবে, তখন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তারা আপনা থেকেই বুঝবে ও চিন্তা করবে। তখন তাদের সামনে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও বর্তমান কর্মসূচী তুলে ধরতে হবে এবং এর

সাথে তাদেরকে পরিচিত করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, আমরা এই এই কাজ করছি। আমাদের এ কাজ ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে আপনারা যদি একমত ও সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমাদের সাথে যোগ দিন। অন্যথায় অন্য কোথাও এ কাজ হচ্ছে বলে জানা থাকলে এবং তাতে আপনি একমত ও সন্তুষ্ট থাকলে সেখানেই যোগদান করুন। তাও যদি না হয়, তাহলে আপনি আপনার সমমনা লোকদের সমবেত ও সংগঠিত করুন। কেননা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম না করলে ইসলামকে বাস্তবায়িত ও চালু করা যেমন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তেমনি তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হতে পারেনা এবং আল্লাহর কাছে কোনো মুসলমান নিজের এই দীনি দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পেতে পারেনা।

এ কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমানে যখন সমগ্র দুনিয়ায় বাতিল শক্তি জয়ী এবং খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থা দোর্দন্ড প্রতাপে ক্ষমতাসীন, তখন এই শক্তিকে হটিয়ে তার জায়গায় সত্য দীন তথা আল্লাহর আনুগত্যমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কোনো খেলার বিষয় নয়। এটা অত্যন্ত কঠিন ও প্রাণান্তকর কাজ। এতে শুধু জানমালের নয় বরং সব রকমের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে। বরং সত্য কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা এসব ক্ষয়ক্ষতিকেই এই পথের মাইল ফলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেনে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ-

"আমি অবশ্য অবশ্য তোমাদেরকে ভয়ভীতি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, জানমাল ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। এসব সত্ত্বেও যারা অবিচল থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে (তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত ও শুভদৃষ্টির) সুসংবাদ।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৫)

এর কারণ বলা হয়েছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

"তোমরা কি ভেবেছ, এমনি বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখলেন না যে, তোমাদের মধ্যে কারা বাস্তবিকপক্ষে এ জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে ও ধৈর্যধারণ করতে প্রস্তুত।" (আলে ইমরান ঃ ১৪৩)

اَ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ-

"মানুষ কি এই ভ্রান্ত ধারাণায় লিপ্ত আছে যে, শুধু 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে আর কোনো পরীক্ষা নেয়া হবেনা? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন তাদের মধ্যে কে নিজের অংগীকারে সত্যবাদী আর কে মিথ্যা বুলি আওড়ায়।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لاَ رَسُوْلِهٖ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً-

"তোমরা কি ভেবেছ যে এমনিই ছাড়া পেয়ে যাবে? অথচ এখনো অল্লাহ দেখে নিলেন না তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর পথে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে অন্তরংগ বন্ধু বানায়নি।" (সূরা তাওবা ঃ ১৬)

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামকে নিছক প্রথাগতভাবে নয় বরং একথা ভালোভাবে জেনে বুঝে গ্রহণ করে থাকে যে, বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব মেনে নেয়া ছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো গ্যারান্টি নেই, আর ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস ও দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের একমাত্র পথ এটাই, তাহলে তাকে এ কথা ভালো করে জেনে নিতে হবে যে, এ পথ মক্কার অলিগলি, তায়েফের বাজার, সূর পর্বতের গুহা এবং বদর অহুদ ও হুনাইনের রণাঙ্গনের মধ্য দিয়েই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। তাই এ পথের পথিকদের এসব ষ্টেশন অতিক্রম করার প্রস্তুতি নিতে হবে। কুরআন ও হাদীসে মুমিনগণ, সৎকর্মশীলগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং এই পথের পথিকদের যে গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সে গুণ গুলোর অধিকারী হওয়া মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য। আর যেসব দোষ-ত্রুটি মুনাফিক, ফাসিক ও যালিম লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং যা সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, সেগুলোকে নিজ নিজ চরিত্র থেকে দূর করতে হবে। প্রত্যেক মুমিনের উচিত নিজ চরিত্র, কর্ম, আখলাক, লেনদেন, আচার ব্যবহার ও ইবাদত সবকিছুকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার প্রকৃত মান নির্ণয় করতে থাকা এবং আল্লাহর পথে জান ও মালের সকল শক্তি নিয়ে জিহাদ করার জযবা, আগ্রহ, হিম্মত ও সাহস বারবার মেপে নিজের ঈমান ও আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের গভীরতা নির্ণয় করতে থাকা। দেখবেন, আপনার মন নিজেই বলে দিতে থাকবে আপনি ঈমানের কোন্ স্তরে আছেন।

ইবাদতের তাৎপর্য ও প্রাণশক্তি

প্রিয় ভাইয়েরা,

ইবাদত সম্পর্কে একথা খুব ভালোভাবে অন্তরে গেঁথে নেবেন যে, 'ইবাদত' প্রকৃতপক্ষে মানুষের সেসকল কাজের নাম, যা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে ও একনিষ্ঠভাবে করা হয়। এ ছাড়া আর কোনো কিছুর নাম ইবাদত নয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইবাদত নামে পরিচিত অন্যান্য কাজও কেবল তখনই ইবাদত বলে গণ্য হবে, যখন তা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ঠিক সময় নির্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে এবং ইপ্সিত নিয়তে করা হবে। এসব শর্তের কোনো একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দেশের আইন, আদালতের বিচারক ও মুফতী উক্ত কাজকে বৈধ ও ইবাদত বলে রায় দিলেও আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য থাকবেনা এবং তা ইবাদতে গণ্য হবেনা। কথাটাকে সহজবোধ্য করার জন্য নিম্নে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১ দেখুন, সালাত কতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু যদি এতে একটি রাকাতও কম বা বেশী করা হয় , ছোট সূরা ফাতিহার পরিবর্তে কেউ কোনো বড় সূরা এমনকি পুরো কুরআন শরীফও পড়ে ফেলে, আল্লাহু আকবারের পরিবর্তে অন্য কোনো দোয়া পড়ে, অপবিত্রাবস্থায় বা অসময় নামায পড়ে, কিংবা অন্য কোনো শর্ত লংঘন করে, তবে তার সালাত কি শুদ্ধ হবে? কখনো নয়। তা আপনি দশ মিনিটের পরিবর্তে আধঘন্টা বা পৌণে এক ঘন্টা ধরেও যদি নামায পড়েন, তবুও কোনো লাভ নেই।

২ রোযা কতো বড় ইবাদত। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি সেহেরীর সময় শেষ হবার পরও খেতে থাকেন, ইফতার ইচ্ছাকৃতভাবে সূর্যাস্তের আগে করেন, ঈদের দিন রোযা থাকেন, রমযান বাদ দিয়ে সারা বছরও যদি রোযা রাখেন, তবে তাতে কি রমযানের ফরয রোযা আদায় হবে? কখনো নয়, রোযা ঠিক আল্লাহর হুকুম অনুসারে রাখলেই ইবাদতে পরিণত হবে।

৩ যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য। যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছিলো। কিন্তু হিসাব ছাড়া কোনো ভুল পাত্রে বা শরীয়ত বিরোধী কাজে যাকাত ব্যয় করলে তা যতো বেশী পরিমাণেই দেয়া হোকনা কেনো, যাকাত আদায় হবেনা এবং যাকাতের চেয়ে দশগুণ বেশী টাকা দিলেও নয়।

৪ হজ্জ অত্যন্ত মহিমান্বিত ইবাদত। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দিষ্ট কার্যাবলী ব্যতীত মক্কা মদীনা ঘুরে আসা কিংবা হজ্জের সময় ছাড়া সারা বছর মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করে নির্দিষ্ট কাজগুলো করলেও হজ্জ আদায় হবেনা।

এর কারণ হলো, আমাদের কাজকর্ম ও ইবাদতে আসল যে জিনিসটি তাকে ইবাদতে পরিণত করে, সেটি হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের জযবা বা আবেগ, তাঁর বিধানের অনুকরণ ও অনুসরণ, তাঁর বিধিনিষেধ পালন ও তাঁর সন্তোষ লাভের প্রবল আগ্রহ।

কোনো বিশেষ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা আসল ইবাদত নয়। একজন সুস্থ সবল মানুষের জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়া এবং রমযানে রোযা রাখা যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তবে তার বিপরীতে একজন রুগ্ন ব্যক্তির জন্যে বসে বা শুয়ে নামায পড়া এবং রমযানের রোযা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী সময় কাযা করা ইবাদত। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য যাকাত দেয়া যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তবে একজন অভাবী মানুষের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা ইবাদত। এক সময় পর্যাপ্ত পানির বর্তমানে ওযু করে নামায পড়া ইবাদত হয়ে থাকলে অন্য সময় অপর্যাপ্ত পানি থাকার অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়া ইবাদত। বাড়িতে থাকাকালে পুরো নামায পড়া যেমন ইবাদত, প্রবাসকালে কসর (অর্ধেক) নামায পড়াও তেমনি ইবাদত।

এ থেকে জানা গেলো, আসলে ইবাদত হলো আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কাজেই মানব জীবনের যে যে কাজে আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর সীমারেখার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, সেই সেই কাজ আল্লাহর ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। এমনকি একজন কৃষক যদি সারা দিন আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে থেকে যাবতীয় কাজ করে, সময় মতো কাজ ছেড়ে দেয়, সময় মতো নামায পড়ে, সময় মতো চাষ করে, সময় মতো বীজ বপন করে, সময় মতো ক্ষেতে পানি ও সার দেয়, সময় মতো গরুকে ঘাস খাওয়ায়, নিজের সন্তানদের ভালোবাসে এবং তাদের হক আদায় করে, তাদেরকে সঠিকভাবে লালন পালন করে, আল্লাহর ভয়ের কারণে কারো খিয়ানত ও কারো অধিকার হরণ করেনা বরং আল্লাহর হক ও সৃষ্টির হক যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করে, তবে তার গোটা জীবনই ইবাদতে পরিণত হবে। এমনকি মানব বংশ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দাম্পত্য অধিকার প্রদান এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভালোবাসা, স্নেহ করা এবং তত্ত্বাবধায়ন ও সংরক্ষণ করাও আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আসলে এ ধরনের লোকেরা সদাসর্বদা আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকে এবং এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়না। তার জীবন "আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি" এই আয়াতের বাস্তব দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না জেনে না বুঝে চুপে চাপে কয়েকটা শব্দ জপ

করে অথচ সারা দুনিয়ার ওপর খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তির বিজয়কে অত্যন্ত শান্তভাবে দেখতে থাকে এবং তারই অধীনে নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকে, এ ধরনের লোককে তো আল্লাহর রসূল বেঈমান বলে আখ্যায়িত করেছেন- পরহেজগার ও ইবাদতকারী বান্দা তো নয়ই।*

আধ্যাত্মিকতা কী জিনিস?

"আমল ও ইবাদত" বিহীন "আধ্যাত্মিকতারও" এমন একটা ভুল ও বিভ্রান্তিকর ধারণা জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, তা বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে গোমরাহীর মুখে নিক্ষেপ করেছে। প্রথমত কুরআন হাদীসে এ শব্দটির কোনো উল্লেখই নেই। এটি আসলে পরবর্তী সময়কার সৃষ্টি। কুরআন ও হাদীসে তো কেবল "ঈমান" "ইসলাম" "ইহসান" ইতায়াত (আনুগত্য) "তাকওয়া" "ইত্তিবায়ে রসূল" (রসূলের অনুসরণ) এবং "খাশিয়াতুল্লাহ" (আল্লাহর ভয়) এসব পরিভাষাই পাওয়া যায়। তথাপি রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার কোনো অর্থ যদি থাকেই তবে তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মানুষের রূহ বা আত্মা তার পশুত্বের ওপর এমনভাবে জয়ী হবে যে, এরপর জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তার পাশবিক ও প্রবৃত্তিগত কামনা বাসনা কোনোক্রমেই তার আত্মার ওপর বিজয়ী হবেনা, বরং তার আত্মা তার আবেগ ও কামনা বাসনাকে এমনভাবে দমন করবে যে, যতো বড় ভয় বা লোভ প্রদর্শন করা হোক এবং যতো বড় লাভ লোকসানই হোক, তা তাকে আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তা মেনে চলা থেকে বিরত রাখতে পারবেনা। সে দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের জান ও মাল আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর দীনের বিজয়ের জন্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এটাই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা এবং আল্লাহ একেই মানুষের বিরাট সাফল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলো সে মহা সাফল্য লাভ করলো।"(সূরা আহযাব ঃ ৭১)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ

* হাদীসে রসূল সা. বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করা উচিত, তা না পারলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও নিন্দায় সোচ্চার হওয়া উচিত। আর তাও না পারলে মন দিয়ে তাকে ঘৃণা করা উচিত। তাও যদি না পারে এরপর ঈমানের আর কোনো স্তর নেই।

اَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ- ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবে? (তাহলো,) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি (আন্তরিকভাবে) ঈমান আনবে, আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে। তোমরা যদি জ্ঞান রাখো তবে এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন, তোমাদেরকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহসমূহ। এটা (অর্থাৎ পথে চলতে পারা এবং এই পুরস্কার লাভ করা) হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা আস্‌সাফ ঃ ১১-১২)

আল্লাহর নিকট যদি এই হয়ে থাকে সাফল্য, তাহলে আপনি নিজের মনগড়া রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা দ্বারা আর কোন্ জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আল্লাহর হুকুম তো হলো, "আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি করতে বলছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

সুতরাং রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা অর্জন করার সম্ভাবনা যদি থেকে থাকে, তবে আল্লাহর হিদায়াত ও তাঁর রসূলের প্রদর্শিত পথে চলার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

আমি যতোদূর উপলব্ধি করতে পেরেছি, বর্তমান যুগের মানুষ যে আধ্যাত্মিকতার পেছনে ছুটে চলেছে, তা হলো, একজন মানুষ অপর মানুষের দিকে বিনা উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হতে থাকবে, অন্য কথায়, স্বতস্ফূর্ত আকর্ষণ ও টান অনুভব করবে। এটা আসলে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক স্বাভাবিক সমতা তথা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মের ঐক্যের ফল। কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সাথে এই তিনটি বিষয়ে যতো বেশি সমতা ও অভিন্নতার অধিকারী হবে, সে তার দিকে ততো বেশি আকৃষ্ট হবে। নচেত এর কি কারণ ছিলো যে, যে কথা শুনে হযরত খাদীজা রা. হযরত আবু বকর রা. ও হযরত আলী তাৎক্ষণিকভাবে আকৃষ্ট হলেন, সেই একই কথা সারা জীবন শুনেও আবু জাহেল ও আবু লাহাব অধিকতর বিরোধী ও বিদ্বিষ্ট হতে থাকলো? আজও এমন কোটি কোটি মানুষ বিদ্যমান, যারা গান্ধীর আংগুলের ইশারায় জীবন দিতে প্রস্তুত। কোটি কোটি

মানুষ হিটলার ও মুসোলিনীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে চলেছে। চার্চিল ও রুজভেল্টের নির্দেশে কতো কোটি কোটি মানুষ যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিলো, কে তার ইয়ত্তা রাখে?* এখন প্রশ্ন হলো, এসব কাফের ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তিত্বই কি এখন পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছে। এরই বা কারণ কি যে, এক পীর সাহেবের মুরীদগণ ও একটি গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের পীর ও পথ প্রদর্শকের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার আলোকচ্ছটা দেখতে পায় এবং তারই দিকে আকর্ষণ অনুভব করে? হযরত নূহ আ., হযরত ঈসা আ. ও অন্য কয়েকজন নবীর মধ্যে কি আধ্যাত্মিকতার কমতি ছিলো যে, গুটিকতক লোক ছাড়া আর কাউকে তারা সঙ্গী হিসেবে পেতে সক্ষম হলেননা?

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক ও পীর হযরত জুনাইদ বাগদাদী র. এর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া সহজতর হবে। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গ হিসেবে হযরত জুনাইদের দিগজোড়া খ্যাতি শুনে এক ব্যক্তি সম্ভবত এ ধরনেরই রূহানিয়াত খুঁজতে তাঁর কাছে এসেছিলো। কিছুদিন সে তাঁর সাহচর্যে কাটালো। কিন্তু এতো দিনেও সে নিজের আগমনের কোনো উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেনি, কোনো প্রশ্নও করেনি। অবশেষে একদিন সে যখন বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাইতে এলো, এখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; আপনি কি জন্য এসেছিলেন, আর কেনই বা চলে যাচ্ছেন? সে বললো, আপনি একজন মস্ত বড় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর বিশিষ্ট ওলী – এ কথা শুনেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু আমি এতোদিন থেকেও আপনার মধ্যে তেমন বিশেষ কিছু দেখলাম না।" হযরত জুনাইদ জিজ্ঞাসা করলেন; আচ্ছা, আপনি কি আমার মধ্যে কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু দেখেছেন, সে বললো; না, তেমন কিছু তো দেখিনি। তিনি বললেন, "তাহলে জেনে রাখুন, জুনাইদের কাছে এ ছাড়া আর কিছু নেই।"

সুতরাং বুঝা গেলো যে, কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক অনুসরণ ছাড়া রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার আর কোনো অর্থ গ্রহণ করাই মূলত ভুল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে গোটা ইসলামকে তুলে ধরেছেন, আর রসূল সা. স্বীয় হাদীস ও নির্মল স্বভাব চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা ছাড়া ইসলামকে বুঝবার জন্য মানুষকে অবিকৃত বিবেক বুদ্ধি ও ভালো মন্দ নির্বাচনের ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর যার মন চায়, একাগ্রচিত্তে এই পথে অগ্রসর হোক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুক। আর যার মনে চায় অন্য কোনো পথ অবলম্বন করুক। কেউ যদি এই

---

* মনে রাখতে হবে এ গ্রন্থ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের লেখা। – সম্পাদক

ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থাকে যে, আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী ছাড়াই এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করা ছাড়াই শুধু অন্য কোনো বিশেষ ধরনের মানসিক সাধনা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাফল্য অর্জন করা যাবে, তাহলে তার জানা উচিত, এই ভ্রান্ত ধারণার সপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো সনদ বা সমর্থন নেই। যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর রসূল সা. কিছু বিশেষ কথা বা আখিরাতে মুক্তি লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ (Short cut way) নিজের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর কতিপয় ব্যক্তিকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন, যা কুরআন ও হাদীসের অতিরিক্ত, তবে এটা এমন এক জঘন্য অপবাদ যে, এরূপ কথা যে বলে তার আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর রসূল নিজের সেই দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন যে দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাঁকে নবূয়্যতের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ-

"হে রসূল, তোমার প্রতিপালক তোমার নিকট যা কিছু নাযিল করেছেন, তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও। তা না করলে তুমি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করতে পারবেনা।" (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৭)।

যারা আল্লাহর নবীর সম্পর্কেও এমন কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায়, তারা যে আল্লাহর বান্দা নয় বরং শয়তানের বান্দা ও দালাল, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। প্রত্যেক মানুষের সে যেই হোক না কেন – তাকওয়া, পরহেজগারী, আমল ও আধ্যাত্মিকতাকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করার অভ্যাস করুন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সবসময় কেবল অন্যকে যাচাই করার কাজে নিয়োজিত না থেকে নিজেকে বারবার যাচাই পরখ করতে থাকুন এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে থাকুন। কেননা আল্লাহর কাছে প্রত্যেককে অন্যের কাজের নয়, নিজের কাজের হিসাব দিতে ও জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

"প্রত্যেকে নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী হবে। একজনের দায়ভার আরেকজন বহন করবেনা।" (সূরা আলআনয়াম ঃ ১৬৫)

"তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় সামনে কিছু পাঠিয়ে দিক, আর যার ইচ্ছা হয়, সবকিছু দুনিয়াতেই রেখে যাক। মোটকথা, প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্মের কাছে

জিম্মী হয়ে থাকবে। কেউ নিজের কাজের হিসাব না দিয়ে অব্যাহতি পাবেনা।" (আল্-মুদদাসসির ঃ ৩৭-৩৮)।

ইসলামে মান, মর্যাদা ও প্রতাপ বলতে কী বুঝায়?

শুধু 'আমল', 'ইবাদাত', 'রূহানিয়ত' ই নয় বরং এ যুগে 'সম্মান', 'অপমান', 'প্রতাপ' ও 'পতিত দশা' ইত্যাদি শব্দের অর্থও একেবারেই উল্টে গেছে। বর্তমানে আমাদের সমাজে একমাত্র ধনসম্পদ ও বস্তুগত উপায় উপকরণের প্রাচুর্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে মান সম্ভ্রম, প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতাপ লাভের একমাত্র মাধ্যম। চারিত্রিক মহত্ব, নৈতিক পরিপক্কতা, মহানুভবতা, খোদাভীরুতা ও পবিত্রতার কোনো মূল্য ও কদর নেই। এমনকি একজন জঘন্য থেকে জঘন্যতর এবং নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর মানুষ তথা মদখোর, ব্যভিচারী, জুয়াড়ী, দাংগাবাজ, সন্ত্রাসী, ঘুষখোর, বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিবাজ, ধাপ্পাবাজ ও সকল নৈতিক সীমা প্রকাশ্যে লংঘনকারী ব্যক্তির যদি কিছু ধনসম্পদ ও উপায় উপকরণের প্রাচুর্য থেকে থাকে, তাহলে সমাজে সে-ই মান্য গণ্য, সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। অপর এক ব্যক্তি চাই যতোই মহানুভব, সৎচরিত্র, মহৎস্বভাব ও খোদাভীরু হোক না কেন, কেবলমাত্র ধন সম্পদে অন্যদের চেয়ে খাটো হওয়ার কারণে সমাজে কোনোই মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়না। বস্তুত আধুনিক সভ্যতার উন্নতি ও প্রগতির যাবতীয় গালভরা বুলি সত্ত্বেও বর্তমানে সারা দুনিয়া "লক্ষীপূজা"র ব্যাধিতে ভীষণভাবে আক্রান্ত। এখন এই বিকৃত সমাজকে নতুন করে সঠিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আপনাদেরই কর্তব্য। এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, ইসলামে মহত্ব, আভিজাত্য, সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপের উৎস ধনসম্পদও নয়, বাহুবল অস্ত্র বলও নয়, বড় বড় প্রাসাদ ও বাগবাগিচাও নয়, বড় বড় খেতাব ও পুরস্কার লাভ ইত্যাদিও নয়। বরং এর একমাত্র উৎস হলো মহৎ স্বভাব, সৎ চরিত্র, উত্তম আচরণ, কোমল ব্যবহার, আমানতদারী, খোদাভীতি এবং আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বে অগ্রগামিতা। আলকুরআনের সূরা হুজুরাতের ৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে; "আল্লাহর নিকট সেই বেশি সম্মানিত, যে অধিকতর পরহেজগার, খোদাভীরু ও সৎ চরিত্র।"

অবশ্য সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে প্রচুর ধন সম্পদ ও পার্থিব উপায় উপকরণ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা হবে তার জন্য অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার কারণ। কিন্তু মানবীয় গুণাবলী আছে কিনা তা না দেখে যে কোনো দুই পা বিশিষ্ট প্রাণী বা মানুষরূপী পশুকে কেবল দামিদামি পোশাক পরতে দেখে সম্মানের যোগ্য মনে করা একমাত্র নির্বোধ ও মানুষরূপী পশুদেরই কাজ হতে

পারে। বনের পশুরা তো শক্তি ও খাদ্য পাণীয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু মানুষও যদি এসব উপকরণকে সম্মান ও বড়ত্বের মাপকাঠি বানায়, তাহলে বনের পশুদের সাথেই তাদের তুলনা হওয়া উচিত। আসলে যে মানসিকতার দরুণ আধুনিক দার্শনিকদের একটি গোষ্ঠী হযরত আদম আ.এর পরিবর্তে অরণ্যের পশুদেরকেই নিজেদের আদি পিতা মনে করে, সেই মানসিকতা থেকেই এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এ ধরনের লোকদেরকে মানুষ গণ্য করা তো দূরের কথা, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পশুর চেয়েও অধম আখ্যায়িত করেছেন ঃ

"তাদের দিল আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করেনা। তারা নিরেট পশুর মতো বরং তার চেয়েও অধম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৯)।

শ্রম খাটা, মুটেগিরি করা, দোকানদারি করা, জুতো বানানো, কাপড় সেলাই করা বা এ ধরনের ছোটোখাটো কুটির শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা মানুষের জন্য কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়; বরং প্রবৃত্তির লালসার গোলাম হয়ে নিজের মন মস্তিষ্ক, বিবেক বুদ্ধি ও ঈমানকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়াই প্রকৃত লজ্জার বিষয়। দুনিয়ার লোভে মত্ত হয়ে, যে মাথাকে আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর সামনে নোয়ানোর জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন, সে মাথাকে পশুর চেয়ে অধম মানুষের সামনে নোয়ানোটাই প্রকৃত লজ্জা ও কলংকের বিষয়। যে মুখকে আল্লাহ নিজের প্রশংসার জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন, তা দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা ও স্তাবকতা করা; মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পৃথিবীকে সুখ শান্তি নিরাপত্তা ও ইনসাফের আবাসভূমি বানানোর জন্য আল্লাহ যে যোগ্যতা, ক্ষমতা ও গুণাবলী মানুষকে দিয়েছিলেন, সেসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও গুণাবলীকে বাতিল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী ও গোমরাহীর বিকাশের জন্যে ব্যবহার করা এবং এর বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাকে জীবিকার উপায়ে পরিণত করা সত্যিকার কলংকের বিষয়। মিথ্যা বলা, চুরি করা, খিয়ানত করা ঘুষ খাওয়া, অন্যের অধিকার হরণ করা, যুলুম অত্যাচার করা এবং আল্লাহর নাফরমানীমূলক অন্যান্য কাজই হলো প্রকৃত লজ্জার কাজ। সম্ভবত এ ধরনের লোকদেরই উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা সূরা আরাফের ১৭৬ নং আয়াতে।

সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"কিন্তু সে তো মাটির দিকেই (অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থের দিকে) ঝুঁকে পড়লো এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসারী হয়ে রইলো। এমনকি তার অবস্থা হয়ে গেলো কুকুরের মতো। তুমি তার ওপর হামলা করলেও সে জিভ ঝুলিয়ে রাখে,

হামলা না করলেও জিভ ঝুলিয়ে রাখে। যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের উদাহরণ এ রকমই। তবে তুমি এসব ঘটনা তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা চিন্তাভাবনা করবে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে বড়, সমস্ত সম্মান ও গৌরব তারই প্রাপ্য। আল্লাহর দৃষ্টিতে সে ব্যক্তিই বড়, যে আল্লাহর হিদায়াতের পথ গ্রহণ করে, শুধু তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল শক্তি ও যোগ্যতাকে তাঁরই পথে নিয়োজিত করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষের উন্নতির সর্বোচ্চ স্তর এবং মানুষের মুক্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ।

আল কুরআনে এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"আদেশ দেয়ার সকল ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। মানুষকে তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম মেনে চলোনা। কেননা এটাই মানুষের জন্য সঠিক জীবন পদ্ধতি। তবে অনেকেই তা জানে না।"

(সূরা ইউসুফ ঃ ৪০)

"যে ব্যক্তি নিজের আপাদমস্তক আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পণ করে, অতঃপর তাতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা অবলম্বন করে (অর্থাৎ এরূপ একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে, যেনো সে আল্লাহর সামনেই উপস্থিত থেকে সর্বক্ষণ তাঁকে দেখছে) তার প্রতিদান তার মনিবের কাছে রয়েছে। এ ধরনের লোকদের জন্য কোনো ভয় বা মনোকষ্টের আশংকা নেই।"

(সূরা বাকারা ঃ ১১২)

ইসলাম সমগ্র মানব জাতির ধর্ম

সম্মানিত ভাইয়েরা,

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির দীন নয় যে, তা সেই নির্দিষ্ট জাতি বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা আল্লাহর দীন। তাই তার পানি ও বাতাস যেমন সকল সৃষ্টির জন্যে তেমনি ইসলামও সমগ্র সৃষ্টির ও সমগ্র মানব জাতির জীবনাদর্শ। আল্লাহ যেমন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রভু, প্রতিপালক এবং তাঁর অনুগ্রহ ও যাবতীয় জীবনোপকরণ যেমন সকল মানুষের জন্যে উন্মুক্ত, তেমনি তাঁর পক্ষ থেকে আগত এই হিদায়েতের পথ ও তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা সমগ্র মানব জাতির জন্য। এই জন্যই দেখা যায়, তিনি কুরআনে সমগ্র মানব জাতিকে একই সাথে সম্বোধন করেছেন, সকলের সামনে একই ধরনের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বলেছেন যে, তোমাদের জন্যে তোমাদের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহর একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া আর কোনো সঠিক ও বৈধ পথ নেই। সূরা বাকারার ২১ থেকে ২৩ আয়াত দেখুন ঃ

“ওহে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই মনিবের ইবাদত ও আনুগত্য করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এটা করলেই তোমরা দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হওয়া ও আখিরাতে আযাব ভোগ করা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশা করতে পারো। তিনিই তো তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, ওপর থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা নানা রকমের ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। এসব জেনেও কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ো না। আর যদি তোমাদের সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে তোমরা তাঁর মতো কোনো একটা সূরা রচনা করে দেখাও। আর এ কাজের জন্য তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সমর্থককে সাহায্যের জন্য ডাকো।”

শুধু তাই নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকেও কোনো বিশেষ জাতি, দেশ বা ভূ-খন্ডের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠাননি, বরং সমগ্র দুনিয়ার জন্যে করুণা ও অনুগ্রহ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। আর তাঁকে নির্দেশও দিয়েছেন, তিনি যেনো এ বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দেন। সূরা আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াত দেখুন ঃ

“বলো, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছাড়া আর মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর ওপর এবং সেই নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি নিজেও আল্লাহকে ও তাঁর নির্দেশাবলীকে মেনে চলেন, আর তাঁরই অনুসরণ করো। আশা করা যায়, এভাবে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।”

তাছাড়া তিনি নিজের এই মহাগ্রন্থ কুরআনকেও কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়েত ও উপদেশরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

“এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ তথা স্মরণিকা। এখন তোমাদের মধ্য থেকে যে সঠিক পথ অবলম্বন করতে চায় সে করুক।” (সূরা তাকভীর, ২৮)

“বড়ই কল্যাণময় সেই মহান আল্লাহ, যিনি হক ও বাতিলের প্রভেদকারী এই গ্রন্থ স্বীয় বান্দার ওপর (মুহাম্মদ সা. এর ওপর) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি বিশ্ববাসীকে (হক ও বাতিল) সম্পর্কে অবহিত করেন।”(আল ফুরকানঃ১)

“রমযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আর এই কুরআন হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও এমন শিক্ষায় পরিপূর্ণ, যা সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরে।” (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)।

ইসলামকে শুধু গ্রহণ নয়, তার প্রচার প্রতিষ্ঠাও জরুরী

আল্লাহর দীন, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের দাওয়াত যে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত ও সার্বজনীন, সেকথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পর আল্লাহ একথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, ইসলামকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নিজে গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং যারা তাকে একমাত্র সত্য ও সঠিক জীবন পদ্ধতি বলে স্বীকার করে, তাদের দায়িত্বের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, ইসলামকে নিজের চারপাশের জগতেও প্রচার ও চালু করার জন্য তাদেরকে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে। আর প্রয়োজন হলে এই পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর সাথে লড়াইও করতে হবে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য সূরা হজ্জের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও সন্তোষ লাভের পথে যারা বাধা দেয় তাদের সাথে যথোচিতভাবে লড়াই করো। তিনি তোমাদেরকে নিজের এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং ইসলামে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। এ হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীমের পথ। আল্লাহ ইতিপূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এখন এই কুরআনেও তোমাদের এই নামই বহাল রইলো, যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী থাকেন এবং তোমরা সমগ্র মানব জাতির ওপর সাক্ষী থাকো। (অর্থাৎ রসূল যেমন তোমাদের কাছে ইসলামকে পৌঁছিয়েছেন, তেমনি তোমরাও তা নিজ নিজ যুগের মানুষের কাছে পৌঁছাবে।)"

এখানে একথাটা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব রসূল স.এর ওপর ছিলো, সেই একই দায়িত্ব এখন কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। কিয়ামতের দিন যেমন রসূল সা. কে প্রমাণ করে দিতে হবে যে, তিনি শুধু তাত্ত্বিক ও নির্ভুলভাবে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা সমকালীন বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং হাতে-কলমেও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও মূলতত্ত্ব কী? তার চারিত্রিক নীতিমালা, আচার-আচরণ, সভ্যতা ও কৃষ্টি কিরূপ? তার সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি কিরূপ, তার শত্রুতা মিত্রতার সীমা ও নীতিমালা কি? তার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা কি? তার যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি কি? তেমনিভাবে তাঁর উম্মতকেও আল্লাহর সামনে একথা প্রমাণ করে দিতে হবে যে, তারাও এসব জিনিস সমকালীন বিশ্বের সামনে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলো। তা না করতে পারলে নিস্তার পাওয়া যাবেনা। এ কাজ এতো জরুরী, এতো গুরুত্বপূর্ণ এবং এতো মৌলিক যে, তার ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ বলছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অবশ্যই এমন থাকা চাই যারা সততা ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজে বাধা দেবে। যারা এ কাজ করবে তারাই মুক্তি পাবে।" (আলে-ইমরান ঃ ১০৪)।

অর্থাৎ আসলে তো সমগ্র জাতিরই প্রধান কাজ হওয়া উচিত কল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু কিছু লোক এরূপ নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক যারা এই কাজে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। অন্যান্যরা তাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হবে এবং এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সরবরাহ করবে।

এ কাজ কতো গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, তা নিম্নের আয়াত থেকেও সহজেই বুঝা যায়। যাতে আল্লাহ তায়ালা এই কাজকেই রসূল প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি রসূলকে সত্য দীন ও হিদায়াত সহকারে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাকে অন্যসকল ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দেবেন।" (সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮)

আর শুধু মুহাম্মদ সা. নন বরং আল্লাহর প্রত্যেক রসূলই আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার অন্য সকল ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার লক্ষ্য নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। সূরা শুরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমাদের জন্যেও সেই একই জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নূহকে দেয়া হয়েছিলো, যা তোমার কাছে ওহী করা হয়েছে, যা ইবরাহীমকে, মূসাকে ও ঈসাকে দেয়া হয়েছে। সবাইকে এই আদেশই দেয়া হয়েছে যে, এই দীনকে কায়েম কর।"

আল্লাহর দীন কায়েম না থাকা এবং তার ওপর অন্য কোনো মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা বিজয়ী থাকাটা আল্লাহর দৃষ্টিতে ফিৎনা ও ফাসাদ অর্থাৎ গোমরাহী ও অরাজকতা এবং তা দূর করা মুসলমানদের ওপর ফরয। যারা এ ফরয পালন করেনা তাদেরকে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেন।

"তোমরা তাদের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়তে থাক, যতোক্ষণ না সকল ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন শুধু আল্লাহরই হয়ে যায়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৩)।

সূতরাং দুনিয়ায় আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠিত থাকাকেই সুস্পষ্ট ভাষায় ফিৎনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অবসান ঘটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো জরুরী।

এই ফরয পালনে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের গড়িমশি ও ব্যর্থতার পরিণামে তাদেরকে যে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, সে কথার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন;

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎ লোক খুব কমই ছিলো, যারা মানুষকে অরাজকতা ও অসততার বিস্তার ঘটাতে নিষেধ করতো। যারা নিষেধ করেছিলো তাদেরই কেবল আমি রক্ষা করেছিলাম। নচেত অনাচারীরা তাদের প্রাপ্ত বিলাসোপকরণ ভোগেই মত্ত থেকেছিলো এবং অপরাধে লিপ্ত ছিলো। তোমার প্রভু এমন নন যে, জনপদের অধিবাসীরা সৎ হলেও জনপদগুলোকে ধ্বংস করে দেবেন।" (হুদ ঃ ১১৬-১১৭)।

কাজেই আল্লাহর দীন যে জায়গায় বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন নেই, সেখানে তাকে বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন বানানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। আর এ কাজের চেষ্টা ও উদ্যোগ যাতে আশপাশে চলতে থাকে, সর্বান্তকরণে তাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। এ রকম কোনো উদ্যোগ না থাকলে কিংবা সন্তোষজনকভাবে না থাকলে নিজেদেরই উদ্যোগ নেয়া ও উৎকৃষ্টতর পন্থায় সম্পন্ন করে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই এ কাজ থেকে বিরত থাকার অবকাশ নেই। এ ফরয পালনে ব্যর্থতার পরিণাম থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের ২৫নং আয়াতে বলেছেনঃ

"সেই ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষা করো, যা শুধু তোমাদের মধ্যকার পাপীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। জেনে রেখো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"

এই পরিস্থিতি কখন দেখা দেবে, সে কথা সূরা আ'রাফের ১৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"অবশেষে তারা যখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া নির্দেশাবলীকে ভুলে গেলো, তখন আমি অসৎ কাজ থেকে যারা নিষেধ করতো তাদেরকে রক্ষা করলাম। আর বাদবাকী সকল যালিমকে তাদের নাফরমানীর পরিণামে কঠোর শাস্তিতে আক্রান্ত করলাম।"

অর্থাৎ যারা সংস্কার ও সংশোধনের চেষ্টা চালাতো কেবল তাদেরকেই রক্ষা করা হয়েছে। আর বাদবাকী যারা অসৎকর্মে সরাসরি জড়িত অথবা নিজেরা সরাসরি জড়িত না হলেও অন্যদেরকে তা থেকে বাধা দেয়না তাদের সবাইকে আযাবে আক্রান্ত করা হয়েছে।

রসূল সা. এ কথাটিরই নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা নেতৃস্থানীয় লোকদের অপরাধের জন্যে সাধারণ মানুষকে সাধারণত শাস্তি দেননা। শাস্তি দেন কেবল তখন, যখন তারা স্বচক্ষে খারাপ কাজ হতে দেখে, কিন্তু তা থেকে নিষেধ করা ও অসন্তোষ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা

সত্ত্বেও করে না এবং তাতে বাধা দেয়না। পরিস্থিতি যখন এতো দূর গড়ায়, তখন আল্লাহ সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে শাস্তি দেন।"

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এই বাণীগুলো থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা যথেষ্ট নয়। রসূল সা. এর অনুসারী ও উম্মত হিসেবে ইসলামের শুধু প্রচার ও তাবলীগ নয় বরং প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের কাজে জানমাল খরচ করাও আমাদের কর্তব্য। কেননা তাছাড়া ইসলামের ওপর ঈমান আনার দাবি একটি প্রমাণহীন দাবি ছাড়া আর কিছু নয়।

অমুসলিমদের জন্যে ইসলামের বার্তা

সবার শেষে আমি আমার অমুসলিম ভাইদের সামনেও কিছু আহ্বান রাখতে চাই। কেননা আগেই বলেছি, সত্য ও ন্যায়ের এই দাওয়াতকে অমুসলিম ভাইদের সামনেও উপস্থাপিত করা আমাদের ওপর ফরয। আমরা গভীর আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তাদের বলতে চাই ঃ ভাইয়েরা, "ইসলাম" আমাদের বা আর কারো ব্যক্তিগত পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এ হচ্ছে সকল আদম সন্তানের সম্মীলিত সম্পদ। এ হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ, মঙ্গল, মুক্তি এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের স্রষ্টা মালিক ও মনিবের প্রেরিত এমনসব মূলনীতি, যা গ্রহণ করে মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গায় মুক্তি ও মঙ্গল লাভ করতে পারে। কাজেই এ মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করা আপনাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। গ্রহণ না করলে এ মূলনীতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, বা অন্যকারো কোনো অনিষ্ট হবেনা। স্বয়ং আপনাদেরই অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। আপনার চোখের সামনে বিস্তৃত আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে খোলা চোখে, খোলা মনে পর্যবেক্ষণ করুন। দেখবেন, প্রতিটি জিনিস প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধ্যান দিতে থাকবে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আগুন, পানি, বাতাস, ফল, ফুল, গাছপালা, তরুলতা, লোহা, তামা, স্বর্ণ, সকল জড় পদার্থ এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস এক শ্বাসত ও অমোঘ বিধানের অটুট বাঁধনে আবদ্ধ। এর বিরুদ্ধে এগুলো চুল পরিমানও নড়াচড়া করতে পারেনা। সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী কর্তৃক একটা অকাট্য ও অটল আইনের শর্তহীন আনুগত্য করা এবং নিজেদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে অব্যাহতভাবে আবর্তন করতে থাকার ওপরই পৃথিবীর এই দিন, রাত, মাস, বছর ও ঋতুর নিয়মিত গমনাগমন নির্ভরশীল। আমাদের ফল, ফুল ও বাগানের এই নয়নাভিরাম সমারোহ তো এ কারণেই সম্ভব হচ্ছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি উৎপন্ন দ্রব্যকে ঋতুচক্র, মাটি ও

আবহাওয়ার সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট ঋতুতে ও মৌসুমে এবং নির্দিষ্ট মাটিতে ও আবহাওয়ায় অবাধে জন্ম ও বিকাশ লাভ করে চলেছে। আপনাদের এতোসব কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন তো এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, আগুন, পানি, বিদ্যুত এবং অন্য যতো জড় পদার্থ, যতো বস্তু ও শক্তি এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয়, সেগুলোকে আপনাদের সেবার জন্যে এক অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়মের আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো ওযর আপত্তি করারও অবকাশ নেই। আপনাদের বিজ্ঞান কলেজ, গবেষণা কেন্দ্র এবং হাসপাতাল এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে যে, এই বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছুই অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়মকানুন মেনে চলছে, আর সেগুলো অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি তা দ্বারা একই রকম উপকৃত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা আছে যে, পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), জীববিদ্যা (Biology), দেহবিদ্যা (Physiology), চিকিৎসাবিদ্যা (Medical Science), মহাশূন্যবিদ্যা (Astronomy), ভূ-বিদা (Geolgy), কৃষি, প্রকৌশল বা জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখা বিশ্ব স্রষ্টার এইসব অমোঘ, অটল ও চিরন্তন নিয়ম বিধিরই সমষ্টি মাত্র। নিজের অজেয় ও পরাক্রান্ত শক্তির জোরে তিনি সমগ্র বিশ্বে এইসব নিয়মবিধি চালু করে রেখেছেন এবং মানুষকে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নিয়মবিধির একটি নিয়মবিধিও এমনকি এর কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও কোনো বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ বা কারিগরের রচিত বা নির্ধারিত নয়। বিজ্ঞানী ও কারিগরগণ এসব নিয়ম বিধিকে তৈরি বা রচনা করেননা, বরং অভিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নীরিক্ষা দ্বারা কেবল জানতে (Discover) পারেন যে, অমুক ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature) এরূপ। নিউটন (Newton), গ্যালিলিও (Galileo), কোপার্নিকাস (Copernicus), রুথারফোর্ড (Rutherford), আইনস্টাইন (Einstein), এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ সবাই শুধু বিশ্বজগতে প্রচলিত ও কার্যকর কিছু কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম জানতে পেরেছিলেন মাত্র। এদের কেউ সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে রচনা করেননি। অনুরূপভাবে, কেমিস্ট এবং ওষুধ প্রস্তুতকারকগণ ওষুধ তৈরি করা ও বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের নিয়ন্তা ও রচয়িতা নন, বরং উদ্ভাবক ও গবেষক মাত্র। চিকিৎসকরাও রোগ নিরাময়ের নিয়ম এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার নীতিমালা রচনা করেন না, বরং অবগত হন মাত্র। আপনাদের প্রকৌশলীরাও যন্ত্র প্রয়োগ (Mechanics) ও যন্ত্র নির্মাণের কৌশল ও নিয়মবিধি তৈরি করেননা, অবগত হন মাত্র এবং অবগত

হয়ে তা প্রয়োগ করেন। মহাশূন্য বিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী ও জৈব বিজ্ঞানীরা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞরাও বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন এলাকার জন্যে নিয়মবিধি তৈরি করেননা, বরং জ্ঞান অর্জনপূর্বক তদনুসারে কাজ করেন। কেননা প্রত্যেক বস্তু সংক্রান্ত এইসব নিয়মকে বিশ্ব স্রষ্টা এইসকল বস্তুর অভ্যন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, তা কোনো অবস্থায় উক্ত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না। এ কারণে এগুলোকে প্রাকৃতিক আইনও (Law of Nature) বলা হয়ে থাকে।

একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারেনা যে, এইসব নিয়ম ও বিধির রচনা, বিন্যাস, সংস্কার বা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে কোনো সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোনো পরাক্রমশালী রাজা বাদশা, একনায়ক, রাষ্ট্রপতি, পীর ফকির, পাদ্রী পুরোহিত এমনকি সমগ্র মানব জাতিও যদি তার সমগ্র শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ নিয়ে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে বা রদবদল করতে চায়, তবে তা করতে তারা অক্ষম। সূর্য থেকে নিয়ে পরমাণু পর্যন্ত, বড় বড় রাজা-বাদশা থেকে নিয়ে একটা তুচ্ছ পিপড়ে পর্যন্ত এবং নবী-ওলী থেকে শুরু করে পাপী-অপরাধী পর্যন্ত সকলের ওপর এ সব প্রাকৃতিক নিয়ম সমানভাবে ও অকাট্যভাবে কার্যকর।

আপনারা এও দেখতে পান যে, প্রাকৃতিক নিয়মের লংঘন এবং তা থেকে বিচ্যুতির নামই বিপর্যয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত নিয়মবিধি (Law of Mechanics) একটু লংঘন করে দেখুন। দেখবেন, তৎক্ষণাত উক্ত যন্ত্রে নিয়ম লংঘনের আনুপাতিক হারে ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হয়ে যাবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার নীতিমালা ভংগ করুন, দেখবেন, আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। কৃষি নিয়মাবলী লংঘন করে দেখুন, আপনার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এক কথায়, জীবনের যেকোনো দিক ও বিভাগে প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করে দেখুন, সেখানে কোনো না কোনো আকারে বিপর্যয় ও বিকৃতি আসবেই। প্রত্যেক যন্ত্রের কর্মক্ষমতা, শরীরের সুস্থতা, ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং দুনিয়ার সকল জিনিসের উন্নতি, সফলতা ও সমৃদ্ধি স্রষ্টার রচিত ও নির্ধারিত এই প্রাকৃতিক নিয়মে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে পালন করার ওপরই নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি বা জাতি যতোবেশি এই সব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে ও তা প্রয়োগ করবে, তার এই দুনিয়ায় ততোবেশি সাফল্য, উন্নতি এবং দুনিয়ার উপায় উপকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য অর্জিত হবে। এই পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্তত বস্তুগত জীবনের পর্যায়ে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাকৃতিক নিয়মকে সঠিকভাবে জানা এবং তার প্রয়োগ ও অনুসরণ দ্বারাই উন্নতি, অগ্রগতি, সাফল্য ও বিজয় অর্জন সম্ভব, আর এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম

একমাত্র জগতস্রষ্টা আল্লাহরই তৈরি।

সম্মানিত সুধিমণ্ডলী!

আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত সৃষ্টি, প্রতিটি বস্তু ও পদার্থের জন্যে এবং স্বয়ং মানুষেরও বস্তুগত ও প্রাকৃতিক জীবনের জন্যে যেমন অমোঘ, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম রচনা ও কার্যকর করেছেন, যা মেনে চলার ওপরই মানুষের সুখ শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের জন্যেও আল্লাহ তায়ালার রচিত কিছু অকাট্য ও অলংঘনীয় আইন ও নীতিমালা রয়েছে, যা যথাযথভাবে পালন করার দ্বারাই মানুষ এই দুনিয়ায় পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করতে পারে এবং মৃত্যুর পর মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। তবে প্রাকৃতিক আইন ও নৈতিক আইনে পার্থক্য হলো, প্রাকৃতিক আইনগুলোকে আল্লাহ নিজের অজেয় শক্তি বলে কার্যকরী করেছেন, আর নৈতিক আইনগুলোকে (যথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও চারিত্রিক আইন) বলপ্রয়োগে চালু করার পরিবর্তে মানব জাতির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা চাইলে এগুলো কার্যকরী করবে, নচেত করবেনা। যেহেতু বিশ্বের গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের (Law of Nature) অধীন, তাই এই আইনগুলো লংঘন করার ফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহর নৈতিক ও সামস্টিক জীবন সংক্রান্ত আইনগুলো লংঘনের পরিণাম তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায়না, এমনকি অনেক সময় শত শত বছরেও দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়না। এজন্যে প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান অর্জনের কাজ স্বয়ং মানুষের ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে সে নিজেই এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কিন্তু নৈতিক ও সামষ্টিক জীবন সংক্রান্ত খোদায়ী আইন-কানুনের শিক্ষা ও প্রচারের জন্য আল্লাহ তায়ালা পরম অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতিতে নিজের নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর সকল শিক্ষাকে অবিকলভাবে ও নিখুঁতভাবে নিজ নিজ জাতির কাছে শুধু পৌছে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং প্রতিটি শিক্ষা অনুসারে কাজ করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই এবং যখনই মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর নবীদের শিখানো নীতিমালা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়েছে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসভূমির রূপ ধারণ করেছে। প্রায় প্রত্যেক জাতির জনসাধারণের মধ্যে অতীতের যে "সোনালী যুগের" কিচ্ছাকাহিনী প্রচলিত আছে, সেসব আসলে আল্লাহর ঐ সব মনোনীত ও প্রিয় বান্দা বা তাঁদের অনুসারীদের হাতে দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হওয়ার যুগের কিচ্ছাকাহিনী অথবা তাদের শিখানো নীতিমালার বেশির ভাগ যখন জনগণ মেনে চলতো, তখনকার কথা।

আল্লাহর এই দূতগণ নিজ নিজ যুগে সর্বত্র মানুষকে আল্লাহর ছাড়া অন্যান্যদের পূজা উপাসনা, দাসত্ব ও আনুগত্য ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং (বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রকৃত উপাস্যের রচিত) সত্য দীনের আনুগত্য দাসত্ব ও উপাসনা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁরা তাদেরকে বলেন, তোমরা এক আল্লাহর পরিবর্তে আর যাদের পূজা, উপাসনা ও আনুগত্য করে থাকো, তারা সবাই তোমাদেরই মতো আল্লাহর বান্দা ও দাস। স্থান কালভেদেও মানব জীবনের বিভিন্ন যুগে সভ্যতার তারতম্যের কারণে কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্নতা থাকলেও তাদের মূল শিক্ষা ছিলো এক ও অভিন্ন এবং তা ছিলো এইযে, "এই চন্দ্র, নক্ষত্র এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি ও বস্তু এক আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনিই তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা, মৃত্যু ও জীবনদাতা। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু সেই আল্লাহর উপাসনা করো, শুধু তাঁরই কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস চাও। যে লুটতরাজ, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, মদখুরী, জুয়া, ব্যভিচার ও অনুরূপ যেসব অপকর্মে তোমরা লিপ্ত আছো, ওসবই পাপকাজ, ওসব পরিত্যাগ করো আল্লাহ ওসব কাজ পছন্দ করেননা। সত্য কথা বলো, ইনসাফ করো, কারো প্রাণ সংহার করোনা, কারো অর্থসম্পদও অপহরণ করোনা। যা কিছু নাও, ন্যায়সঙ্গতভাবে নিও, যাকিছু দাও সংগতভাবে দিও। তোমরা সবাই মানুষ এবং সকল মানুষ সমান। বর্ণ, বংশ, ও ধনসম্পদে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রমাণিত হয়না। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় সততায়, মহত্ত্বে ও নিষ্কলুষ চরিত্রে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করে, সে-ই উচ্চ মানের মানুষ। যে সৎ নয়, সে নীচ ও হীন মানুষ। মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে হাজির হতে হবে। তিনি প্রকৃত ন্যায় বিচারক। তার কাছে না কোনো সুপারিশ কাজে লাগবে, না ঘুষ চলবে এবং না কারো বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হবে। সেখানে শুধু ঈমান ও সততার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। এ সম্পদ যার কাছে থাকবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যার কাছে তা থাকবেনা সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে"।*

আল্লাহর সকল নবী সমকালীন মানুষকে ধর্মের এসব শিক্ষাই দিয়েছেন যেটুকু ধর্মীয় পার্থক্য আপনারা নবীদের অনুসারীদের মধ্যে দেখতে পান, তা আসলে নবীদের শিক্ষার আনুগত্য ও অনুসরণের কারণে দেখা দেয়নি, বরং তা থেকে বিচ্যুতি, উদাসীনতা, প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ এবং দুনিয়া লাভের উন্নত প্রতিযোগিতার ফল। এ বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ এইযে, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতিতে আগত নবীগণের অনুসারীরা তো দূরের কথা, স্বয়ং এ যুগের মুসলিম উম্মাহও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। আল্লাহর শরীয়তী বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহর ওপর তারা সবাই অবিচল ঈমান রাখে, এ দুটি যেসকল

* 'ইসলাম পরিচিতি ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদ, সে ব্যাপারেও তারা একমত এবং উভয়ই তাদের কাছে অবিকৃত ও পূর্ণাংগভাবে সুরক্ষিত রয়েছে। তথাপি তারা কতিপয় ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ক্ষুদ্র মতভেদকে তিল থেকে তাল বানিয়ে বিভিন্ন ফের্কা ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিভক্তি এতো তীব্র রূপ নিয়েছে যে তা দেখে মনে হয়, ওরা শুধু বিভিন্ন মাযহাবের নয় বরং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী।

তাছাড়া এ সত্যটাও মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে সুবিদিত যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর (তথা জড় পদার্থ ও প্রাণী) জন্য নিজের পক্ষ থেকে যে প্রাকৃতিক আইন (Laws of Nature) নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা প্রত্যেক শ্রেণীর সৃষ্টির প্রতিটি অংশের জন্য এবং তাদের সামষ্টিক অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও বিকাশ বৃদ্ধির জন্য এক ও অভিন্ন। স্থান ও কালের বিভিন্নতার দরুণ কোনো শ্রেণীর সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রাকৃতিক আইন রচনায় ও প্রয়োগে ভেদাভেদ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রতি শ্রেণীর সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালা যে আইন ও বিধান প্রথম দিন থেকেই তৈরী করে দিয়েছেন, সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত সেটাই তার বিধান। বস্তুত সাদা হোক বা কালো হোক প্রাচ্যের হোক বা পশ্চাত্যের হোক, সকল মানুষ যখন একই রকম সৃষ্টি এবং তারা একই ধরনের স্বভাবের অধিকারী, তখন তাদের জন্য তাদের স্রষ্টার পক্ষ থেকে স্থান ও কালের প্রভেদের কারণে ভিন্ন ভিন্ন আইন, বিধান বা দীন কিভাবে আসতে পারে? হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সকল নবী যে একই দীন নিয়ে এসেছেন তা যুক্তি তথা বিবেক বুদ্ধিরও দাবি। আবার কুরআন হাদীস থেকেও অকাট্যভাবে এ সত্য প্রমাণিত। মানব জাতির কাছে এই সত্য উদভাসিত করার জন্য আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে কুরআনে বলেছেন, তোমাকে কোনো আনকোরা দীন দেয়া হয়নি বরং এ হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীগণ যে দীন নিয়ে আসতেন অবিকল তাই ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ–

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদর জন্যে সেই দীনই বাছাই করেছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা এখন আমি তোমাকে ওহী যোগে পাঠালাম এবং যার নির্দেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম। আমার নির্দেশ ছিলো এইযে, তোমরা এই দীনকে কায়েম করো এবং এ নিয়ে নিজেরা দল-উপদলে বিভক্ত হয়োনা।" (সূরা আশ্ শুরা-১৩)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْم بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًام بَيْنَهُمْ-

"আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দীন। এ দীনকে বাদ দিয়ে কিতাবধারীরা যে বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করেছে, তার একমাত্র কারণ হলো, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও তারা শুধু পরস্পরের প্রতি বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছে।" (আলে-ইমরান, ১৯)

ওহীভিত্তিক ধর্মগুলোর মধ্যে উদ্ভূত মতভেদের প্রকৃত কারণ কি, তা এই আয়াতটিতে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আরো একটা অনস্বীকার্য সত্য হলো, ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র কুরআনই সেই গ্রন্থ এবং (নবীদের মধ্য থেকে) পৃথিবীতে আগত আল্লাহর প্রতিনিধি বা দূতগণের মধ্যে কেবল মুহাম্মদই সা. সেই ব্যক্তিত্ব, যার পথ নির্দেশনা ও জীবন বৃত্তান্ত বর্তমানে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত। বর্তমানে অতীত নবীগণের আদর্শ ও শিক্ষা সঠিকভাবে বিদ্যমান থাকা তো দূরের কথা, তাঁদের মৃত্যুর দু'চারশো বছর পরও তা সঠিকভাবে দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিলো কিনা, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, বিগত দেড় হাজার বছরের উত্থানপতন এবং মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্যজনক অধোপতন ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আগত সমস্ত শিক্ষা আজও অবিকল সেভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে, যেভাবে রসূল সা. তা রেখে গেছেন। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপারও নয়, স্বয়ং কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) যেমন আল্লাহর সর্বশেষ রসূল, তেমনি কুরআনও আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ। আর এই দু'টি চিরদিনের জন্য হিদায়েতের একমাত্র উৎস। সত্যান্বেষীদের জন্য হিদায়েতের এই আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করে রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"নিশ্চয় আমিই (কুরআন নামক) এই স্মরণীকা নাযিল করেছি এবং আমিই তাঁর রক্ষক।" (আল- হিজর ঃ ৯)

এই উক্তি যে অকাট্য সত্য, তার প্রমাণ বাইরে থেকে খোঁজার প্রয়োজন নেই, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি অক্ষর যে আপনাদের সামনে সুরক্ষিত রয়েছে, তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ কারণেই সত্যান্বেষীদের জন্য এখন এ ছাড়া আর কোনো উপয়ান্তর নেই যে, হিদায়েতের অন্য সকল উৎস (যাকে মানুষ বিকৃত করতে করতে নষ্ট করে

ফেলেছে) প্রত্যাখ্যান করে কেবল কুরআন ও মুহাম্মদ সা. এর দিকে ফিরে আসতে হবে এবং এই দুই উৎস থেকেই দিক নির্দেশনা নিতে হবে। এইসব ধর্মীয় মতভেদ নিরসনের জন্যইতো আল্লাহ তায়ালা ইতিপূর্বে বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত ঐশী শিক্ষাকে একত্রিত করে কুরআনে ও শেষ নবীর পবিত্র জীবন চরিত্রে চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে আগত সকল হিদায়াতকারী নবী রসূলের এটাই ছিলো শিক্ষা, তারা সবাই আল্লাহর সত্য বার্তাবাহক ছিলেন, মুহাম্মদ সা. এর সাথে সাথে তাদেরকেও সত্য নবী স্বীকার করা ও তাদের ওপর ঈমান আনা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাঁদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে অস্বীকার করলেও মানুষ সত্যের গন্ডি থেকে তথা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। কুরআনে মুহাম্মদ সা. কে আদেশ দেয়া হয়েছে ঃ

"হে মুহাম্মদ! বল ঃ আমরা আল্লাহকে মানি, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে মানি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইয়াকূবের বংশধর, মূসা ও ঈসার ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাও মানি। আমরা এসবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করিনা। আমরা আল্লাহর অনুগত মুসলিম। এই আনুগত্য ও ফরমাবদারীর দীন (ইসলাম) ছাড়া অন্য কোনো পন্থা যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, তার সেই পথ ও পন্থা কখনো গ্রহণ করা হবেনা। এবং আখিরাতে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮৪-৮৫)

এতএব, আমরা যে কুরআন এবং মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ ও কর্মকে এখন হিদায়েতের একমাত্র উৎসরূপে পেশ করি, তার কারণ কখনো এটা নয় যে, আমরা আল্লাহর প্রেরিত পূর্বতন নবী রসূলগণের প্রতি বিদ্বেষ বা হঠকারী মনোভাব পোষণ করি। এ ধরনের মনোভাব যতো ক্ষুদ্র আকারেই পোষণ করা হোক না কেন, স্বয়ং ইসলামের দৃষ্টিতেই তা কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার শামিল। আল্লাহর দীন ও তাঁর শেখানো জীবন ব্যবস্থা জানার এখন একমাত্র পথ এটাই যে, কুরআন ও মুহাম্মদ সা. এর সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যারা আশপাশের বিশ্ব প্রকৃতিতে বিস্তৃত প্রকাশ্য সত্যসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আন্দাজ অনুমান, দর্শন ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পথ অবলম্বন করে চলেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহর রসূলগণ তো মানুষকে বহু খোদার গোলামী থেকে মুক্ত করে এক খোদার গোলামী, সত্যানুসরণ, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি, সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা, বিশ্বস্ততা, পবিত্র দাম্পত্য জীবন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাতে ও শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। আপনারা

বলনুতো, এক বিশ্ব স্রষ্টার পরিবর্তে বহু খোদা, নির্ভেজাল সত্য প্রীতির পরিবর্তে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ, সততার পরিবর্তে শঠতা ও ধোকাবাজী, ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার পরিবর্তে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা, চারিত্রিক পবিত্রতার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান যৌন উচ্ছৃংখলতা, শান্তি নিরাপত্তা ও আত্মীয় সেবার পরিবর্তে নির্যাতন ও যুলুম এককথায়, আল্লাহ ও তার রসূলদের শিক্ষা ও আখিরাতের জবাবদিহীর চেতনাবিহীন জীবনকে কি কোনোভাবে ধর্মীয় জীবন তো দূরে থাক, ভদ্র ও মার্জিত জীবনও কি বলা যায়? নিশ্চয়ই তা বলা যায়না। আর তা যখন বলা যায়না, তখন অন্ততঃপক্ষে "সত্য দীন" এবং যিনি তা এনেছেন তার জীবনী তো জানতে চেষ্টা করুন। এজন্য একটু কষ্ট করতে হলে করুন। কোনো দাওয়াত বা নীতিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন তো পরে ওঠে। কিন্তু এই আচরণটাকে কিভাবে সঠিক বলা যায় যে, একজন মানুষ কারো ওপর নিছক হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি বশতঃ নিজের পরকালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে এবং একটা উপকারী বিষয়কে অকারণে জানবারও চেষ্টা করবেনা? বস্তুগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নিমিত্তে আপনাদের দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে আপনাদের দীর্ঘকাল ব্যাপী যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়ে গেছে, তার জন্য কি আপনারা ঐ মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহীত সকল সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকর জিনিসকে বর্জন করবেন? এটাকে তো কোনো বুদ্ধিমান মানুষ যুক্তিসংগত আচরণ বলতে পারেনা। সদাচার কল্যাণ ও মংগলের পথ তো শত্রু বা বন্ধু যার কাছ থেকেই পাওয়া যাক, গ্রহণ করা উচিত। আরো একটা কথা ভেবে দেখুন। মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে আপনারা তো স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিজ্ঞান, অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়ম ও বাণিজ্যিক রীতিনীতি যা মুসলমানরাও ব্যবহার করে থাকে, তাকে আপনারা ছেড়ে দেননি। তাহলে মানব কল্যাণের নিয়ামক যে নীতিমালা ও আদর্শকে আরবী ভাষায় ইসলাম তথা আল্লাহর একক ও সর্বাত্মক আনুগত্যের পথ নাম দেয়া হয়েছে, তাকে শুধু মুসলমানরা গ্রহণ করেছে এবং তাকে তারা নিজেদের ধর্ম বলে দাবি করে–এই কারণে কেন পরিত্যাগ করবেন?

ইসলাম কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা তার সম্পত্তি, যে তদনুসারে জীবন যাপন করে। পাকিস্তান বা ভারতের লোকেরা যদি তা মেনে চলে তাহলে এটা তাদের। আরবরা মেনে চললে এটা আরবদের। যদি ইউরোপবাসী এটা গ্রহণ করে তাহলে এটা তাদেরও হবে। আব্দুল্লাহই হোক, রামদাসই হোক বা করতার সিংহ হোক, কারো প্রতিই নিছক বিশেষ জাতি বা গোত্রের সদস্য হিসেবে তার

কোনো শত্রুতা বা মিত্রতা নেই। ইসলাম শুধু এমন লোক চায়, যারা তার অনুকরণ ও অনুসরণ করবে, চাই তারা যে কোনো বর্ণ বা বংশোদ্ভূত লোকই হোক না কেন, এমনকি সে যদি কোনো মূর্তিনির্মাতা অমুসলিমেরও ছেলে হয় তবুও সে খলীলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে। আর কোনো নবীর ছেলে যদি ইসলামকে ছেড়ে দেয়, তবে সে কাফির ও মুশরিক তথা অমুসলিমে গণ্য হবে নূহের বন্যার সময় ডুবে যাওয়া লোকদের সাথে সাথে তাকেও ডুবিয়ে দেয়া হবে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকারী একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা যা বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং রচনা করে তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, যা চৌদ্দশো বছর ধরে আসল ও অবিকৃত অবস্থায় বহাল রয়েছে এবং যার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তি, নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে অতুলনীয় ও নজীরবিহীন ছিলো বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, সেই পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থাটাকে মানুষ একটু পড়ে পর্যন্ত দেখবেনা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত করবেনা এটা কেমনতর বুদ্ধিমত্তা? তাকে বিবেচনা পর্যন্ত করতে রাযী না হওয়া কি ধরনের ইনসাফ? অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ দেশের মুসলমানরা যদি নিছক নামের মুসলমান না হয়ে খাঁটি ও যথার্থ মুসলমান হতো, তারা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতো, তাহলে এখানকার সকল অধিবাসী সত্য, ন্যায় ও মানব কল্যাণের এই পথে ঐক্যবদ্ধভাবে সমবেত হয়ে পরস্পরে পরমাত্মীয়ের মতো সুখশান্তি ও হৃদ্যতাপূর্ণ জীবন যাপন করতো। যে মুসলমানদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকার কারণে আপনারা, আমাদের অমুসলিম ভাইয়েরা, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছেন, সেই মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে ইসলামের সাথে কতোটুকু সম্পর্ক আছে? তারা বড়জোর নিজেদের সভা ও মিছিলে "নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, ইসলাম জিন্দাবাদ" ইত্যাদি শ্লোগান দেয় এবং কিছু কিছু নামায রোযা করে। এ ছাড়া জীবনের আর যতো লেনদেন, কায়কারবার, আচার, ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, আইন, শাসন এবং অন্যান্য জাতীয় ও সামষ্টিক কর্মকান্ড, রাজনীতি সবই তো ইসলামের অনুকরণ ও অনুসরণের বাইরে। এসব ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য জাতির রীতিনীতিই অনুসরণ করছে। আমাদের ও আপনাদের বহিরাগত প্রভুরা এ দেশে যে রীতিনীতি চালু করেছে, ওরা সেসব রীতিনীতিই মেনে চলছে। কিন্তু যে আল্লাহ শুধু মুসলমানদের প্রভু নন বরং সকল মানুষের প্রভু, সকল মানুষের উপাস্য এবং সকল মানুষের বাদশাহ, সেই আল্লাহর রচিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মুসলমানদের সাথে জিদের বশে শত্রুতা পোষণ করা অন্য কারো ক্ষতি সাধন নয়–নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনার শামিল।

তাছাড়া এটাও একটু ভেবে দেখুন, আপনারা যে পানি খান, তাও পর্যন্ত সেই আল্লাহরই সৃষ্টি। তাঁরই দেয়া খাদ্য খান। তাঁরই বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করেন। নিজের জমিতে ও কারখানায় তাঁরই প্রাকৃতিক আইন (Laws of Nature) অনুসারে কাজ করেন । শরীর ও স্বাস্থ্য, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ লওয়া, স্পর্শ করা, ঠান্ডা ও গরম ভোগ করা, নিজের মনমগজ এবং চারপাশে ছড়ানো ছিটানো উপকরণাদি ও শক্তিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহরই প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি অনুসরণ করে থাকেন। আর এই বাস্তব সত্যটিও আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে যে, প্রাকৃতিক জীবনের পরিমন্ডলে মানবীয় সাফল্য ও উন্নতি পুরো মাত্রায় বিশ্বস্রষ্টার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান অর্জন ও তদনুসারে যথাযথভাবে কাজ করার ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় একথা বুঝতে অসুবিধা কোথায় যে, মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থাৎ ইচ্ছাধীন ও আইনগত পরিমন্ডলেও মানবীয় কল্যাণ, শান্তি এবং প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি ও সাফল্য লাভ আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তী বিধান অনুসারে চলার ওপরই নির্ভরশীল? সুতরাং প্রাকৃতিক জীবনের ন্যায় নিজের জীবনের ইচ্ছাধীন পরিমন্ডলেও আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের আনুগত্য ও অনুসরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণ করে একটু দেখুন।

আল্লাহর ওয়াস্তে এসব ভিত্তিহীন ও অন্ধ বিদ্বেষ পরিহার করে খোলা মনে আল্লাহর শেষ কিতাব ও তাঁর শেষ রসূলের শিক্ষা অধ্যয়ন করুন। সময় খুবই দ্রুততার সাথে কেটে যাচ্ছে। জীবনের অবসর দ্রুতবিলীন হয়ে যাচ্ছে। কে জানে, আল্লাহর দীনের পতাকা নতুন করে উত্তোলনের কাজটি এখন এ দেশের মানুষকে দিয়েই করানো হবে কিনা এবং মানবরূপী দানবদের কবল থেকে মৃতপ্রায় মানব জাতিকে উদ্ধার করার কৃতিত্ব এখন এই জাতির ভাগ্যেই নির্ধারিত হয়েছে কিনা? ইসলামের দাওয়াত যেরূপ সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে এ অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে, তাতে চৌদ্দশো বছর আগে রসূল সা. এর দেয়া এই ভবিষ্যৎ বাণী তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে, পূর্বদিক থেকে আমি ঠান্ডা বাতাস পাচ্ছি। এ ভবিষ্যদ্বানীটির বাস্তবায়নের সময় যদি সমাগত হয়ে থাকে এবং সে সৌভাগ্য যদি আল্লাহ এ যুগের লোকদেরকেই প্রদান করেন, তবে তাতে অবাক হবার কি আছে?

মানবেতিহাসের এই নাজুকতম পর্যায়ে এখন মুসলমানদেরও বুঝা দরকার যে, হয় তাদের নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে ইসলামের পথে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তার দিকে বিশ্ববাসীকে পথপ্রদর্শন করতে হবে এবং

নবীদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হিসেবে তাদের ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নচেত তাদের আমল আখলাক ও স্বভাব চরিত্র দ্বারা ইসলামের আর দুর্নাম না হয়, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কেননা বিশ্ববাসী তাদের চরিত্র ও কর্মকান্ডকে ইসলামী চরিত্রের নমুনা মনে করে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করছে। আল্লাহ না করুন, আল্লাহর দীনের এই ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্বের কারণে আল্লাহর গযব যেনো নেমে না আসে।

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ (وَقُلُوْبَ قَوْمِنَا) عَلٰى دِيْنِكَ-

"হে আল্লাহ! তুমিই তো মানুষের অন্তর পরিবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তুমি পরিবর্তিত করে দাও। হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমাদের (ও আমাদের জাতির) অন্তরকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করো।"

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তরকে আর বক্র করোনা। আমাদের ওপর তোমার রহমত নাযিল করো। তুমিই প্রকৃত দানশীল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮)

ইসলামী দাওয়াত ঃ নারীদের ভূমিকা
মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

[এটি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত (১৯৪৬) জামায়াতের সম্মেলনে মহিলাদের উদ্দেশ্যে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর ভাষণ। –সম্পাদক]

সম্মানিত ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ!

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই শহরে এসে আমি মা বোনদেরকেও কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি। বর্তমান সময় ভুল শিক্ষাদীক্ষা ও ভুল ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ার কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, মহিলারা নিজের ভাত কাপড়ের ন্যায় ইসলাম সংক্রান্ত সমস্ত দায় দায়িত্বও কেবল পুরুষের ওপরই ন্যস্ত বলে মনে করে। অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, মুহাম্মদ সা. এবং অন্য সকল নবী আল্লাহর যে দীন প্রচার করে গেছেন, তার দায়িত্ব পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ওপরও সমভাবে অর্পিত। দায়িত্বের সীমায় তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করা, কায়েম করা, ইসলামের জন্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করা এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান। কোনো মহিলা যদি তার ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, মহিলার তেমনি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহীর সম্মুখীন হতে হবে। দায় দায়িত্ব থেকে সে কখনো অব্যাহতি পেতে পারেনা। আপনি যদি ইসলামের ইতিহাস পড়েন, তাহলে জানতে পারবেন, ইসলাম কায়েম করার সংগ্রামে নারীরাও পুরুষদের সমান সমান অংশ গ্রহণ করেছে। এ কথা সবাই জানে যে, মুহাম্মদ সা. যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন সেই দাওয়াত যারা সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে হযরত খাদীজা রা. ছিলেন অন্যতম। অথচ সে সময় ইসলাম গ্রহণ করা সহজ কাজ ছিলোনা, বরং অবর্ণনীয় বিপদমুসিবতের ঝুঁকি গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত ছিলো। হযরত খাদীজা রা. শুধু যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা নয় বরং তিনিই মুহাম্মদ সা. কে সান্ত্বনা, অদৃশ্য সাহায্য লাভের আশ্বাস এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করার শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁকে প্রবোধ দিলেন, সর্বপ্রথম সত্য ধর্মের পতাকা উত্তোলন করলেন এবং এমন আগ্রহ উদ্দীপনা ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সহকারে উত্তোলন করলেন যে, তা শুধু নারীদের জন্যই

নয়, বরং পুরুষদের জন্যও এবং গোটা মানব জাতির জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে।

তাঁর ধন সম্পদ ও মনমগজ সবই ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। রসূল সা,. তাঁর ইন্তিকালে সবচেয়ে বেশী শোকাভিভূত হন। তাঁর কারণ এটা নয় যে, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেলেন বরং তার কারণ হলো, ইসলামের জন্য যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ত্যাগী, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

ইসলামের অনুসারীদের ওপর কঠিন থেকে কঠিনতর দুর্যোগের সময় অতিবাহিত হয়েছে। এমন কোনো ধরনের যুলুম নির্যাতন নেই, যা তাদের ওপর চালানো হয়নি। কাউকে কাঁটার ওপর দিয়ে টেনে হিচড়ে নেয়া হয়েছে। কাউকে বা উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে। উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে কারো কারো দেহে দাগ দেয়া হয়েছে। কাউকে বা কঠোরভাবে প্রহার করা হয়েছে। এ ধরনের নির্যাতন পুরুষদের ন্যায় নারীরাও সহ্য করেছে। বরঞ্চ মহিলাদের চেয়ে বেশী কষ্ট, বিপদ মুসিবত ও যুলুম ভোগের দৃষ্টান্ত পুরুষরাও পেশ করতে পারেনি। তারা ছিলো এমন সত্যনিষ্ঠ মহিলা, যাদেরকে কোনো চেষ্টা তদবীর দ্বারাই ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিচলিত করা যায়নি। এরপর যখন মক্কার পরিবেশ মুসলমানদের জন্য একেবারেই অসহনীয় হয়ে গেলো। কুরাইশরা তাদের জন্য পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ করে দিলো এবং মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলো, তখন এই হিজরতেও কতিপয় মহিলা অংশ নিয়েছিলেন। এরপর যখন মদীনায় হিজরত করার ডাক পড়লো, তখন মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় যাবতীয় সহায় সম্পদ, মাতৃভূমি ও আপনজনকে ছেড়ে এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সত্যের তথা ইসলামের পক্ষ নিলেন। ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়গুলোতেও নারীদের ত্যাগ ও কুরবানী, তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্কের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মোদ্দাকথা, নারীরা যতোক্ষণ নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতেন, যতোক্ষণ তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো যে, ইসলামের দাওয়াত নারীপুরুষ উভয়কেই দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম কায়েম করার দায়িত্ব উভয়ের ওপরই অর্পিত, ততক্ষণ নারীরা ইসলামের পথে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং পুরুষের ওপর বোঝা হয়ে থাকেননি। আরবের সমাজে এমনিতেও নারীর স্থান খুব নীচে ছিলো। তাই তাদের ওপর যুলুম করা সহজ ছিলো। তারা আল্লাহ ও রসূলের ভালোবাসায় এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, তা শুনলে আজও ঈমান তাজা হয়ে ওঠে এবং মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ওহুদের যুদ্ধে রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এই যুদ্ধে নানা রকমের অবাঞ্ছিত মিথ্যা খবরের পাশাপাশি এই মর্মেও গুযব রটে যে, রসূল সা. শহীদ হয়ে গেছেন। এই গুযব মদীনায়ও পৌঁছে

গেলো। আর যায় কোথায়? জনৈকা আনসারী মহিলা মদীনা থেকে বেরিয়ে সোজা রণাঙ্গনের দিকে ছুটে গেলেন। যে মহান ব্যক্তিত্ব সত্য দীনের তথ্য জানার একমাত্র উৎস ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হলো কিনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। পথিমধ্যে ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী যার সাথেই দেখা হয়, তাকেই তিনি রসূল সা. এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন। এক ব্যক্তি এরূপ প্রশ্নের জবাবে বললেন ঃ "বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের সাথে তোমাকে না বলে পারছিনা যে, তোমার যুবক ছেলে, তোমার পিতা এবং তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন।" এ খবর কতো বড় মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক ও দুঃসহনীয় ছিলো ভেবে দেখুন। এই তিনটি খবরের যে কোনো একটি যথেষ্ট ছিলো একজন মহিলার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়ার জন্য। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহায়গুলো এক এক করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ইসলামের সাথে তার যে সম্পর্ক ছিলো, তা তার ভেতরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, লক্ষ্য করুন। তিনি বললেন ঃ "আমি তোমার কাছে পিতা, পুত্র ও স্বামীর কাহিনী জিজ্ঞাসা করিনি। মুহাম্মদ সা. এর অবস্থা কি, তাই আমাকে বল।" ঐ ব্যক্তি তাকে আশ্বস্ত করলো যে, "আলহামদু লিল্লাহ! তিনি ভালো আছেন।" কিন্তু আনসারী মহিলা বললেন ঃ "আমি তাঁকে স্বচোখে না দেখা পর্যন্ত আশ্বস্ত হতে পারছিনা। অতঃপর রণাঙ্গনে গিয়ে রসূল সা. কে সুস্থাবস্থায় দেখে বললেন। "হে রসূল। আপনি বেঁচে থাকতে আর কোনো মুসিবতের আমি তোয়াক্কা করিনা।"

এ হচ্ছে একটি মাত্র উদাহরণ। মুসলিম মহিলাদের ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল। ইসলামের সকল যুগেই এ ধরনের কীর্তি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান। ইসলামের ইতিহাসের যে যুগে পুরুষদের ঈমানী শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো, তখনও এমন মহিলাদের সন্ধান পাওয়া যাবে যাদেরকে নিয়ে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে পারে।

ইসলামের সোনালী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষরা যেখানে তীরবর্শা নিক্ষেপ করে এবং তরবারী চালিয়ে যুদ্ধ করেছে ও হতাহত হয়েছে, সেখানে নারীরা আহতদেরকে পানি খাইয়েছে, ব্যান্ডেজ করেছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, এমনকি নিজেদের অর্থ সম্পদ ও গহনাপাতি পর্যন্ত দিয়ে সত্য দীনের সাহায্য করেছে। রসূল সা. এর ভক্তের সংখ্যা যখন নিতান্তই কম ছিলো, তখন ছোট ছোট মেয়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাঁকে নিয়ে প্রশংসা মূলক গান গেয়েছে। রসূল সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ "ওহে মেয়েরা, তোমরা কি আমাকে ভালোবাস?" তারা বলেছে ঃ "জ্বী!" তখন তিনি বলেছেন ঃ "আমিও তোমাদের ভালোবাসি।" পুরুষদের মধ্যে ক'জনের এ সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?

এ ছিলো সেই সময়কার অবস্থা, যখন মহিলারা জানতো যে, নারী পুরুষ সকলেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সমভাবে দায়ী। যতো প্রিয় জিনিসই হোক না কেন, এই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে তারা সে বাঁধাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। প্রিয়তম স্বামীও বেদীন হলে সে আমলের মুসলিম নারীদের চোখে ধিকৃত হতো। একেবারেই দরিদ্র ও কপর্দকহীন স্বামীকে তারা নিছক তার সততার কারণে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। এ ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের কখনো সাহস ও হিম্মতের অভাব হয়নি। স্বামী যদি ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো, নারী তৎক্ষণাত তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতো। এমনকি ইসলামের খাতিরে তারা কন্যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত ভেংগে দিয়েছে।

ইসলামের প্রভাব তাদের অন্তরে এতো গভীর ছিলো যে, তাদের সমস্ত ভালোবাসা ও ঘৃণা একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। ছেলেরা যতো সম্পদশালী ও অর্থোপার্জনকারী হোক না কেন, আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত না হলে মায়েদের দৃষ্টিতে তাদের কোনো গুরুত্ব থাকতোনা। স্বামীরা যদি মুমিন না হতো এবং মুহাম্মদ সা. এর সহযোগী না হতো, তবে তারা স্ত্রীদের যথাসর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসলেও স্ত্রীদের কাছে তার কোনো কদর থাকতোনা। এ ছিলো সেই যুগের অবস্থা, যখন মহিলারা বুঝতো যে, তারাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্বের সমান অংশীদার।

কিন্তু ভেবে দেখুন, এখন অবস্থাটা কতো পাল্টে গেছে। আজ মনে করা হয় যে, ভাত কাপড় দেয়া যেমন পুরুষের দায়িত্ব, ইসলামের জন্য চেষ্টা সাধনা করাও তেমনি পুরুষেরই কর্তব্য। তাদের প্রধান ভ্রান্তি হলো, তারা আল্লাহর আইন ও শরীয়তী বিধান মেনে চলাকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনেই করেনা। অথচ রসূল সা. নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। এই ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের ইসলামী জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। এখন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এরকম যে, নারীরাই কার্যত তাদের স্বামী ও সন্তানদের বিপথগামী করার হাতিয়ার ও সমাজের যাবতীয় অপসংস্কৃতির বাহনে পরিণত হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটু স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, বর্তমান খোদাদ্রোহী সভ্যতার যুগে এক শ্রেণীর মহিলা শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে জেঁকে বসেছে। তারা সমাজে যতো ব্যাধি ছড়ায়, তার দ্বারা মহিলারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের কাছ থেকে তা তাদের সন্তানদের কাছে বিস্তার লাভ করে। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা অনেকটা ভিন্ন হলেও শহরাঞ্চলের অবস্থা সাধারণত এ রকমই।

নারীদের বিপথগামী হবার ফল এই হয়ে তাকে যে, গোটা প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক অবস্থা বিষাক্ত হয়ে পড়ে। কোনো মা তার শিশুকে যখন দুধ খাওয়ায়, তখন দুধের সাথে সাথে নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক ভাবধারাও তার মেরুমজ্জায়

সঞ্চারিত করে। মায়ের ধর্মীয় চেতনা, মানবিক চরিত্র ও ঈমানী উদ্দীপনা যদি দুর্বল ও নিস্তেজ হয়, তাহলে শিশুর দেহ ও মনমগজে এমন বিষাক্ত জীবাণু সংক্রামিত হবে, যা যক্ষ্মা ব্যাধিগ্রস্ত মায়ের দুধ খেলেও হয়না।

আমাদের মায়েরা হচ্ছেন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইসলামী শিক্ষার আসল উৎস ও সর্বোত্তম মাধ্যম। আমাদের মায়েরা যতোক্ষণ হযরত আসমা রা. এর পদাংক অনুসরণ না করবেন, ততোক্ষণ কিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের ন্যায় অকুতোভয় বীর জন্ম নেবে? ইসলামের জন্যে শূলে আরোহণরত ছেলেকে দেখেও যে মা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়না বরং ছেলেকে অবিচল থাকতে বলে, সেই মা যতোক্ষণ সৃষ্টি না হবে, ততোক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলে কার পেট থেকে ভূমিষ্ট হবে? এই একই মহীয়সী মহিলা যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তখন তাকে ছেলে এসে তার মনোভাব যাচাই করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলো যে, "মা! আমি কি শত্রুদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেবো, না ক্ষমা চেয়ে নেবো?" তিনি নিজের দুর্বল হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, "তুমি এসব কী পরেছ?" ছেলে বললেন, "বর্ম"। 'তিনি বললেন ঃ "সত্যের পথের সৈনিকদের এসব আবরণের প্রয়োজন নেই। এগুলো খুলে ফেলো এবং সত্যের পথে বুক ফুলিয়ে লড়াই করো, যাতে শত্রুরা তোমাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার সুযোগ না পায়।"

আমরা কেবল এক হাত দিয়ে ইসলামের ভবন নির্মাণ করতে পারিনা। এ কাজে অন্য হাত অর্থাৎ নারীর সহযোগিতা প্রয়োজন। মায়ের কোলই হচ্ছে আমাদের সন্তানদের প্রথম পাঠশালা। মায়ের বুকের এক এক ফোঁটা দুধের সাথে শিশু তার আবেগ, অনুভূতি এবং চরিত্রও নিজ সত্তায় সঞ্চারিত করতে থাকে। মায়ের প্রতিটি কাজ দেখে সে কাজের ধরন ও পদ্ধতি শেখে। মা যদি মুমিন ও মুসলমান হয়, তবে শিশুও মুমিন ও মুসলমান হবে। মা যদি ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সন্তানও ঈমান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা শিশুকে অন্যান্যদের প্রভাব থেকে যদি বাঁচাতেও সক্ষম হই, তবে মা মন্দ হলে মায়ের মন্দ প্রভাব থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারিনা।

পুরুষদের খারাপ চালচলনের প্রভাবও যে শিশুদের জন্যে মারাত্মক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাদের খারাপ প্রভাব থেকে শিশু সন্তানদের রক্ষা পাওয়ার কোনো না কোনো উপায় হয়েও যেতে পারে। কিন্তু মহিলাদের বিকৃতির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কেননা তাদের সৃষ্টি করা বিকৃতি মূল ও শেকড়ের বিকৃতি, ডালপালা বা কান্ডের বিকৃতি নয়। তাই এর কোনো চিকিৎসা সম্ভব নয়। এ কারণেই মায়েদের দায় দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। তারা যে রোগ শিশুদের মধ্যে সংক্রামিত করবে, যত দক্ষ চিকিৎসকই আসুক, তার চিকিৎসা

করতে পারবেনা। যে গাছ চারা অবস্থাতেই রোগব্যাধির শিকার হয়, তার মহীরূহে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

সুতরাং নারীদের কর্তব্য হলো, আজ আমরা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার যে সংকল্প নিয়ে ময়দানে নেমেছি, তাতে তারা যেনো আমাদের সহযোগিতা করেন। তাদের অংশগ্রহণ আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভাগ্যবশত এ যাবত আমরা মহিলাদের কাছে সরাসরি বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি মা বোনদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানাই, আপনারা সমস্ত শৈথিল্য ও উদাসীনতা দূর করুন এবং নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন। আল্লাহর দ্বীন কী? এবং আল্লাহ ও রসূল সা. কী বলেছেন? সেটা জানা ও বুঝা আপনাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটা প্রত্যেক মেয়ে ও প্রত্যেক বোনের দায়িত্ব। এটাও তাদের দায়িত্ব যে, তাদের পেট থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে, তাদেরকে তারা শুধু দুধ খাইয়েই ক্ষান্ত থাকবেনা, বরং নিজ নিজ কাজ ও চরিত্র দ্বারা এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি তৎপরতা দ্বারা তাদের মধ্যে ইসলামের সেই সমস্ত মৌলিক শিক্ষা বদ্ধমূল করে দেবে যা রসূল সা. শিখিয়ে গেছেন। নিজেদের চেষ্টা সাধনার ত্বরিত ফল দেখতে না পেয়ে তারা যেনো হতাশ হয়ে না যান। তাদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। তাদের আদেশ ও উপদেশ বৃথা যেতে পারেনা। নিজ সন্তানদের তারা নিয়মিত ও যথারীতি আদেশ দিতে পারেন এবং মায়ের আদেশ পালন করা প্রত্যেক সন্তানের ওপর ফরয। হযরত রসূল সা. কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, আমি কার সেবা করবো? তিনি জবাব দিলেন ঃ "মায়ের"। সে আবার ঐ একই প্রশ্ন করলো। তিনি আবারো বললেন ঃ "মায়ের"। এভাবে তৃতীয়বারও একই কথা বললেন। কেবল চতুর্থবার বললেন ঃ "পিতার"। কিন্তু স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হলো সহযোগিতার। এই সহযোগিতা সাংসারিক ও ধর্মীয় উভয় ব্যাপারেই চলবে। ঘরোয়া জীবনে যেমন স্বামীর অনুগত, বিশ্বস্ত, আমানতদার ও শুভাকাংক্ষী হওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি ধর্মীয় ব্যাপারে তার কর্তব্য হলো, সে স্বামীকে সৎকাজ ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ দেবে এবং সাংসারিক ও পার্থিব কর্মকাণ্ডে তার ভুলত্রুটিতে যেমন উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়, ইসলামের ব্যাপারে তার গোমরাহী ও অসৎ কর্মে তার চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হবে। এ কাজ করতে গিয়ে যতো দুঃখকষ্ট হোক, তারা তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করে যাবে। কিন্তু স্বামীর অন্যায় ও পাপ কাজ কখনো শান্তভাবে গ্রহণ করবে না। আর যদি কোনো স্বামী সৎকাজ করার সংকল্প নেয়, তাহলে স্ত্রীর নিছক সামাজিক বা পারিবারিক রসম রেওয়াজ ও রীতি প্রথার তাবেদারী করতে গিয়ে তার সৎকাজের ইচ্ছায় বাধা দেয়া উচিত নয়। ইসলামের শিক্ষা কী, তা তাকে অবশ্যই জানতে হবে। যখন সে জানতে পারবে যে, স্বামী সঠিক ও সৎ পথেই চলছে, তখন তাকে সান্ত্বনা ও

প্রবোধ দেবে এবং তার মনোবল বাড়াবে। সুখদুঃখ সর্বাবস্থায় তার সহযোগী ও সমব্যথী হবে। কেননা তার সহযোগিতা ছাড়া পুরুষের হক পথে চলা অত্যন্ত কঠিন। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে স্বামী স্ত্রীর সহযোগিতা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি বাঞ্ছিত ও পছন্দনীয়। যে স্ত্রী ইকামাতে দীনের পথে স্বামীর সহযোগী হয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের খাতিরে বিপদ মুসিবত সহ্য করে এবং উপবাস করে, সেই স্ত্রীই উম্মুল মুমীনীনদের (নবী মহিষী) এবং মহিলা সাহাবীদের পবিত্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আর যে মহিলা এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সে শয়তানের এজেন্টের ভূমিকা পালন করে।

আমাদের আসল সম্পদ মহিলাদের কাছেই রয়েছে। নতুন প্রজন্ম তাঁদেরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে। তাদের মনমগজে তারা হক কিংবা বাতিল যে ছবিই খোদাই করবে, তা কিছুতেই মোছা যায়না। মহিলা এমন লোক তৈরি করতে পারে, যারা আমাদের ইতিহাসকে নতুন করে উজ্জ্বল করবে। আবার ইচ্ছা করলে তারা আজকালকার একজন মামুলী মুসলমান জন্ম দিতে পারে। একটু ভেবে দেখুন যে, একদিন মাত্র হাতে গুনা কয়েকজন মানুষ ছিলো। কিন্তু গোটা পৃথিবী তাদের প্রতাপে কেঁপে উঠেছিলো। আর আজ লোক গণনার দিক দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা কতো বেশি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাদের অস্তিত্বই টের পায় না। আমাদের নিজেদেরই ঘোষণা করে জানাতে হয় যে, আমরা আছি। নারীরা যদি হযরত আছমার রা. দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহলেই তারা ইসলামের সেই মহান সন্তানদের জন্ম দিতে পারবে, যাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে অনুভূত হবে। পৃথিবী চিৎকার করে বলে উঠবে যে, আমার পিঠের ওপর আল্লাহর পথের দূরন্ত পথিকরা চড়াও হয়েছে। তারা যদি এ পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নিতে ও মরতেই থাকবে। কিন্তু এমন লোকের জন্ম আর কখনো হবেনা, যারা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারবে। আমি পুনরায় আমার মা বোনদের কাছে আবেদন জানাবো, তারা যেনো নিজেদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে স্মরণ করেন এবং এই পথে চলার চেষ্টা করেন। আমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা আল্লাহর সত্য দীনকে নিজেদের জীবনে ও অন্যাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবো। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মা বোনেরা যেনো আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেনো পুরুষদেরকে কাজ করার তওফীক দেন এবং মহিলাদের এই পথে তাদের সহযাত্রী বানিয়ে দেন। আমীন!

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২